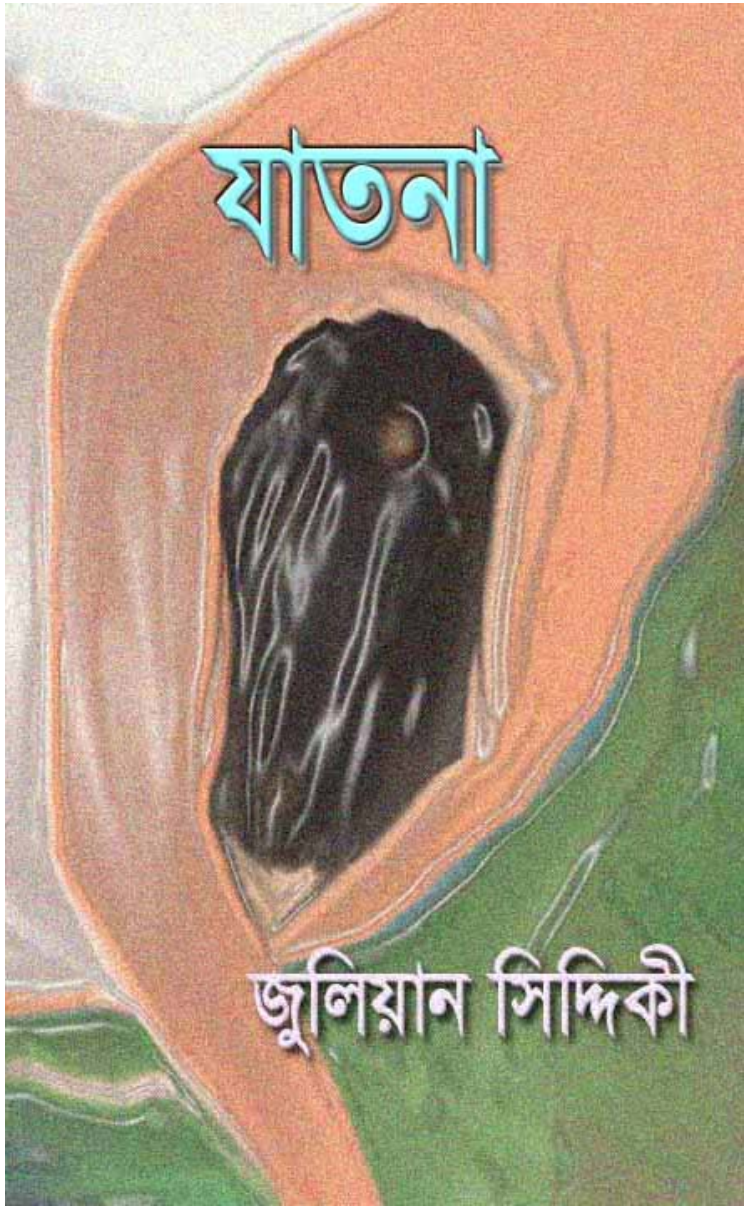

যাতনা

জুলিয়ান সিদ্দিকী

ভালোবাসার যাতনা যত
জুলিয়ান সিদ্দিকী

প্রকাশক:
ভবরঞ্জন ব্যাপারী
নন্দিতা প্রকাশ
১১/১২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে বইমেলা। ২০০৫।

প্রথম সংস্করণ: ২০০৫।

প্রচ্ছদ: রঞ্জন

©
ইশতিয়াক মোহাম্মদ আকিব মাহমুদ।

যা বলা প্রয়োজন

এ উপন্যাসটি ২০০৫ইং সালে নন্দিতা প্রকাশ, ১১/১২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে ভব রঞ্জন ব্যাপারী যখন **'ভালোবাসার যাতনা যত'** নামে প্রকাশ করেন, অনেক পাঠকই বলেছেন নামটা দীর্ঘ বলে কিছুটা ক্লান্তিকর এবং একঘেয়ে। তা ছাড়া প্রকাশক যে প্রচ্ছদটি ব্যবহার করেছিলেন, তা খুব একটা দৃষ্টি নন্দন ছিলো না বলেই অভিমত পেয়েছি। তাই **বাংলা বুক ডট কম**-এর পড়ুয়াদের জন্য দু'টোই পরিবর্তন করে দিলাম।

কিছু প্রমাদ সংশোধন করেছি। আরো কিছু থাকতে পারে, যা আমার দৃষ্টি বা মনোযোগ এড়িয়ে গেছে। এ উপন্যাসে সমাজ-জীবন ও পারিবারিক জীবনের কিছু অসংগতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, টানাপোড়েন, ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছি।

প্রাথমিক ভাবে উপন্যাসটিকে **মমিন মিয়ার** লাম্পট্যের কাহিনী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর অন্তর্গত দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর। জীবনে অনভিজ্ঞ আর অপরিপক্ক মানসিকতার পড়ুয়ার কাছে এটি নিতান্তই স্থূল এবং নারী বিদ্বেষী উপন্যাস বলে বিবেচিত। কেউ এটিকে বলেছেন রিপোর্টিং। কেউ বা বলেছেন কোলাজ। আমি অবশ্য এটি লিখবার সময় এত কিছু ভেবে লিখিনি।

-জুলিয়ান সিদ্দিকী
আঈয়ুন আল জাওয়া
সৌদি আরাবিয়া
১.১.২০০৮।

juliansiddiqi@gmail.com

উৎসর্গ:

হয়তো বা কখনো চলার পথে
নুড়িকণা কুড়িয়ে নেবার ছলে
ফাগুনের আগুন লাগা সাঁঝে
আমার পাশে থামবে খানিক
প্রেম হারানো এ পথের বাঁকে:
ভালোবেসে।
– সেই তোমাকে।

আইডিবি ভবনে সিটি আইটি মেলা হচ্ছে।

অফিসের জন্য একটা কী-বোর্ড কেনার জন্য আজ কিছুটা সকালেই ঘর থেকে বেরিয়েছি। ভেবেছিলাম সকাল সকাল কাজটা সেরে সময় মতই অফিসে পৌঁছে যাবো। কিন্তু এসেই পড়েছি বিপাকে। সব বন্ধ। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো খুলবে দশটায়। এখন কী করি? ঘড়িতে সময় মাত্র পৌনে ন'টা। সকালে বাসা থেকে ঠিক মত নাস্তা করে আসতে পারিনি। খানিকটা দুরে, ফুটপাতের ওপর বেশ কয়েকটা মোবাইল দোকানে চা-বিস্কুট, সিগারেট, কেক-বনরুটি জাতীয় খাবার বিক্রি হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে সেখানে যাই। মনোভাব, সুবিধে হলে খাবো, নয় তো নয়। আমাকে এগোতে দেখে দোকানি বললো, 'কী খাইবেন ভাই? আহেন!'

বললাম, 'কি কি আছে?'

'এই যা দ্যাখতাছেন।'

হাত তুলে তার মালামাল দেখায় লোকটা।

এক প্যাকেট এলাচি বিস্কুট আর একটা কলা নিয়ে খাওয়ার ঝামেলা চুকিয়ে ফেললাম। কিন্তু ঝামেলা বাঁধলো দাম মেটাতে গিয়ে। এক'শ টাকার নোট দেখেই দোকানি আৎকে উঠলো, 'এইডা কি ভাই? এত হবরে হবরে এক'শ ট্যাকার ভাঙতি দিমু কোইথন?'

'কেন, ব্যাচা-বিক্রি হয় নাই?'

'আপনেই আইজগার পরথম কাস্টমার।'

লে-ঠ্যালা! এখন টাকা দেই কোত্থেকে? আমার কাছে খুচরো মোটে চারটা টাকা আছে। আমার তো খুচরো আরো লাগবে। পাশের দোকান গুলোর একটাতে পাওয়া গেলো তাও আবার এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য।

এতেও আবার কত ঝকমারি! দোকানি বললো, 'হারা দিনের লিগা একটা দশ-ট্যাকার বান্ডিল আনছিলাম, অহন দ্যাকতাছি ভাঙ্গানই লাগবো!'

এখান থেকে খুচরো নিয়ে আগের দোকানির টাকা পরিশোধ করে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে মুল গেটের দিকে হেঁটে যাই। ছোট-ছোট ছেলেরা তাদের চকলেট-সিগ্রেট, চুইংগাম কেনার জন্য আমাকে ছেঁকে ধরলো। না না করে কোনো রকমে এদের হাত থেকে বাঁচলাম। এখন গেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষার পালা। দশটা বাজবে তারপর গেট খুলবে, টিকেট বিক্রি শুরু হবে। তারপর সুযোগ পাবো। কী বিশ্রি একটা ব্যাপার! অপেক্ষা করতে আমার কোনো দিনই ভালো লাগে না!

সাড়ে ন'টা বাজে।

লোকজন আসছে। ভেতরে যাচ্ছে। সবারই পাশ আছে। কেউ বুকে, কেউবা কোমরে বেল্টের সঙ্গে, কেউ গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে লেমিনেটেড কার্ডগুলো। কেউ কেউ ওয়ালেটের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কেউ বা আবার শ্রেফ দাপট দেখিয়ে ঢুকে যেতে চাচ্ছে। কিন্তু ভলান্টিয়ার ছেলেগুলো একটুও ঘাবড়াচ্ছে না। সুযোগ মতন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা বেশ ভালো লাগছিলো বলে সেখান থেকে সরছিলাম না। এমন সময় অটোরিকশা থেকে একটা বিশ-বাইশ বয়সের শ্যামলা যুবতী নেমে সোজা উঠে আসতে লাগলো। দেখে আমার দু'চোখ সত্যিই ঘোলা হয়ে আসবার যোগাড়। পরনে তেমন আহামরি কিংবা দামী কোনো পোশাক নেই। চেহারা এবং পোশাকে অভাবী পরিবারের ছাপটা গোপন থাকেনি। যে কেউ বলবে সরকারী কোয়ার্টারের কোনো কেরানি বাপের অতি স্মার্ট মেয়ে। পরনে কেবল সুতির চোস্ত পয়জামা, গায়ে খুব খাটো হাতাঅলা জামা। ওড়নার কারণে হঠাৎ দেখলে মনে হবে জামাটার হাতা কাটা। মেয়েটা আমাকে অতিক্রম করে যাবার সময় দেখলাম তার চুলগুলোও চমৎকার! সব মিলিয়ে এলিভেশন ফাস্টকেলাস!

নিলয়ের ভাষায় একেবারে হটকেক!

আর সে মুহূর্তের মেয়েটার মাঝে এমন একটা আকর্ষন আছে যেটার কারণে যৌনাবেগহীন বৃদ্ধও সুযোগ পেলে একটু ছুঁয়ে দেখতে চাইবেন। যুবকদের তো বাদই দিলাম। তবু সবকিছু এড়িয়েও মেয়েটাকে আমার কেমন কু-রুচিশীলা আর পোশাকের ধরনটা অশ-ীল বলে মনে হলো। বিশেষ করে এমন একটা পরিবেশে এক্কেবারেই বেমানান!

এ বয়সে যত মেয়ে দেখেছি এমন কিম্ভুত মেয়ে কোথাও দেখিনি। তবে পুরোনো ঢাকায় একজন লেখিকার ছোট বোনকে দেখেছিলাম। দেখতে সব মিলিয়ে চমৎকার। চোখের দিক কি ঠোঁটের দিক কিংবা থাই। যে দিকেই চোখ পড়েছে, বুকের ভেতর কিছু একটা ছলকে উঠতো বারংবার। বেড়ে যেতো হৃৎস্পন্দন। সে সাথে গরম হয়ে উঠতো দু'কান। এমনটা হয়তো আমার পাপী মনের অকল্যাণের প্রভাবেই ঘটতো। কিন্তু তাকে কখনো অমার্জিত বা অশ-ীল বলে মনে হয়নি ।

আমাদের দুরসম্পর্কের এক আত্মীয়ার মেয়ে স্বপ্না। আমাদের বাসায় থেকে পড়া-লেখা করতো। ও আর আমি তখন ক্লাস ফোরে রমনা রেলওয়ে স্কুলে পড়ি। তো একদিন আমার আরেক বন্ধু জিকো সহ স্কুল থেকে ফেরার পথে

গল্প করতে করতে আসছিলাম। হঠাৎ স্বপ্না বললো, 'আজ আমরা একটা দারুণ মজার খেলা খেলতে পারি!'

বললাম, 'কী রকম?'

'আমরা একজন আরেক জনকে খুলে দেখতে পারি!'

আমরা অতটুকুতেই রহস্যটা বুঝে ফেলে ভেতরে ভেতরে ভীষন ভাবে নাড়া খেয়েছিলাম। সঙ্গী জিকো মহা উল-াসে বলে উঠলো, 'চল এক্ষুনি শুরু করি!'

স্বপ্না বলেছিলো, 'ছি! এই রাস্তার মধ্যে?'

জিকো বললো, 'ইস্কুলের পেছনে চল। মোটা কৃষ্ণচূড়া গাছটার আড়ালে। কেউ দেখবে না!'

স্বপ্না সবজান্তার মত করে মুখ টিপে হাসলো।

তারপর চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'দুপুরে সবাই যখন ঘুমোবে, তখন!'

বললাম, 'মনে থাকে যেন!'

বেশ টান-টান উত্তেজনা নিয়ে দুপুর পার হবার অপেক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, আমার ভালো লাগছে না। ইচ্ছে হচ্ছিলো ঘরের সবাইকে কোনো অদৃশ্য শক্তিবলে গভীর ভাবে ঘুম পাড়িয়ে দেই। কিন্তু সেই শক্তির নাগাল না পেলেও সেদিন দুপুরের পর সবার অজান্তে আমার চোখের সামনে স্বপ্না নামের অকালপক্ক মেয়েটা যে রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলো, তা বেশ কিছুদিন পালা ক্রমে চলতে লাগলো কয়েক দিন বিরতি দিয়ে। একটা অদ্ভুত শিরশিরে ভাব দিনরাত আচ্ছন্ন করে রাখতো আমার মন।

ফাইনাল পরীক্ষার পর স্বপ্না তার বাবার কর্মস্থলে চলে না গেলে এর যে কী পরিণতি ছিলো আজও এই মধ্য-তিরিশে অনুমান করতে ব্যর্থ হই। তবে স্বপ্নার সেদিনের প্রস্তাব, আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা, এক ক্ষুরে মাথা কামানো সে সময় যেমন খারাপ কিছু মনে হয়নি, আজও ভাবলে তা অশ-ীল বলে মনে হয় না। তবে, নারীর প্রতি আমার কৌতুহলী আর সংযত হয়ে উঠবার পেছনে সবটা কৃতিত্বই স্বপ্নার। আর সে জন্যই শ-ীল-অশ-ীল ব্যাপারটা আমাকে একচোখা করে তুলেছে।

দশটা বাজতেই লোকজন হল-া করতে আরম্ভ করলো টিকেটের জন্য। এবার টিকেটের দাম ধরা হয়েছে দশটাকা। স্কুল পড়ুয়াদের কোনো টিকেট লাগে না। তাই ছয় থেকে নয় বছর বয়সের অনেক প্রাইমারি পড়ুয়া ভিড় করেছে। সিকিউরিটি গার্ড ওদের ধমক-ধামক দিয়ে বলছে চলে যেতে। কখনো

বা মারের ভঙ্গি করে তেড়ে যাচ্ছে। একবার ইচ্ছে হলো বলি যে, ব্যাটা তোর কাজ হলো পাহারা দেয়া। বাচ্চাদের ধমকানো-পেটানো নয়। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে ঠিক করলাম যে, কিছু বলা যাবে না। কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে অফিসে ফিরতে দেরি হয়ে গেলে আরেক সমস্যায় পড়তে হবে।

টিকেট ছাড়তেই ভিড় ঠেলে একটা টিকেট নিয়ে ঢুকে পড়লাম আইডিবি ভবনে। ঢুকেই যে দোকানটা পেলাম সেটাতেই খোঁজ করলাম। পেলাম না। দ্বিতীয়টায় গিয়ে দেখে শুনে সাড়ে তিন'শ টাকায় একটা মিটসুমি কী-বোর্ড নিয়ে সোজা বেরিয়ে আসি।

তাড়া ছিলো বলে দরদাম না করেই রিকশায় চড়ে বলি, 'ফার্মগেট চলো!'

অনেক আগে থেকেই পুলিশ বক্স পেরিয়ে কোনো রিকশা যেতে দেয় না। তাই কিছুটা আগেই নামতে বাধ্য হই। রিকশাঅলার দাবী মতন ভাড়া মিটিয়ে বাকি পথটুকু হেঁটে বিআরটিসি স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাই।

লম্বা লাইন।

বাস যে কখন আসবে তারও ঠিক নেই। তবুও টিকেট কেটে লাইনে দাঁড়াই। মাথার ওপর সূর্য তেতে আছে। ভিড়ের কারণে মাথাটাকে একটু আড়াল করবারও সুযোগ নেই। অগত্যা কী বোর্ডের প্যাকেটই ভরসা। মাথার ওপর দিয়ে রোদ আড়াল করবার প্রয়াস পাই।

সামনের দু'জন খুকি টাইপের বুড়ি কানেকানে কি একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করছে আর কুটকুট করে হাসছে। আর তাদের সামনের লোকগুলোও ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের এই তামাশা দেখবার চেষ্টা করছে একটু পর পর।

যেখানে সাধারণের ভিড় সেখানে ভিখিরিরও ভিড় থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বেশ কয়েকজন ভিখিরি ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা চাইছে।

একজন বুড়ো মতন লোক আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসতেই বললাম, 'অন্যখানে দেখ!'

বুড়ো কটমট করে তাকালো আমার দিকে। বললো, 'হগ্গলতে এই কতা কইলে কোই যাইবাম? আফনেরা এল্হাই খাইবাইন, আমরারে দিতাইন না কিছু?'

মনটা খিচড়ে গেল। মাস্তান-চাঁদাবাজরাও এভাবেই তাদের চাহিদার কথা জানায়। ইচ্ছে হলো বলি, তোমাদের খাবার তো আমার পকেটে নাই! কিন্তু কিছু না বলে বুড়োর দিকে ভালো করে তাকাই। গালের ওপর আড়াআড়ি একটা ক্ষত চিহ্ন গভীর হয়ে বসে আছে। সাদা দাড়িও ওটাকে আড়াল করতে

পারেনি। চোখ দু'টো ক্রুদ্ধ হায়েনার মত জ্বল-জ্বল করছে। শরীরের কাঠামো দেখে মনে হয় যৌবনে গতরে বেশ তাকত ছিলো। হঠাৎ মনের ভেতর একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যায় যে, একাত্তরে এ বৃদ্ধের ভূমিকা কি ছিলো?

রাজাকার না হয়ে পারে না। মন আমার নিজেই উত্তর খুঁজে নেয়।

পুরুষ ভিখিরি দেখলেই মন আমার ভিক্ষে না দেবার নানা বাহানা খোঁজে। মন সন্তুষ্ট হলেই কেবল ভিক্ষে দেই।

বাস এসে গেল।

লোকজন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। আমার আগে দু'জন বাকি থাকতেই গেটকিপার দরজা বন্ধ দেয়। দরজা বন্ধ না করলে অবশ্য দাঁড়িয়েই যেতে পারতাম। কিন্তু সুযোগ তো জুটলো না। বাস চলে যেতেই লাইনে ফিরে আসি। তবে এবার চারজনের পেছনে ঠাঁই পাই।

পেছনে হল-া শোনা যাচ্ছে, 'বাইরের লোক পেছনে দাঁড়ান!'

ফিরে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারি না।

দু'মিনিটের মাথায় আরেকটা বাস চলে এল। লোকজন ভর্তি। সিট পাবো কিনা সন্দেহ। যা ভেবেছিলাম তাই। সিট খালি নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। মেয়েরা বাসের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকলে সমস্যা হয় বেশি। ফ্রি হয়ে দাঁড়নো যায় না।

এক শ্রেণীর পুরুষ আছে যারা ঠেলে ঠেলে মেয়েদের একবারে পাশটিতে গিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াতে চায়। আর ড্রাইভারের ব্রেক চাপবার সুযোগে ইচ্ছে করে গায়ে ঢলে পরে। কেউ কেউ সরি বলে নিজেদের ধুয়ে নেয়। মেয়েরাও মেনে নেয়। এটা যে ইচ্ছাকৃত সেটা বুঝতে পারে না। এ প্রবণতা ইয়াং ছেলেদের চাইতে পঁয়ত্রিশোর্ধ পুরুষদের মাঝেই বেশি দেখা যায়। একটু ছোঁয়া লাগিয়ে এরা কী যে মজা পায় বুঝি না!

খিলক্ষেত স্টেশন থেকে একজন মহিলা উঠলো। প্রায়ই সকালের দিকে ওঠে। চুলগুলো ছোটো-ছোটো। গায়ে সাদা অ্যাপ্রোন। ডাক্তার না ডায়াগনোস্টিক ল্যাবের টেকনিশিয়ান বোঝা মুশকিল! আমার মতে এদের পোশাকের মধ্যে রঙের পার্থক্য থাকা উচিত। আমার খুব ইচ্ছে হল তার পেশার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু ও তো নামে আজমপুর। পাশের সিটে কিংবা আমার পাশে না বসলে তো জিজ্ঞেস করতে পারি না। মেয়েটা দাঁড়িয়েই থাকলো। বসবার সুযোগ পেলো না। বাস এয়ারপোর্ট পেরিয়ে যায়। এ স্টেশনটা পেরোবার সময় ইত্তেফাক-এ ছাপানো জরিনা নামের কুমিল-া- মুরাদনগরের

মহিলাটার কান্নাবিজড়িত মুখটার কথা মনে পড়ে। যে নারী দুবাই থেকে আসবার পর এখানকার সরকারি চোরেরা তার ব্রিফকেস ভেঙে সমুদয় অর্থ লোপাট করেছিলো। অথচ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ একটুও লজ্জা পায়নি। এমনকি প্রথমটায় তারা চোরদের নাম বা সে সময় ডিউটিতে কারা ছিলো তাও পুলিশকে জানাতে চায়নি। তাহলে কি আমরা সাধারণ মানুষ ভাববো পুরোটা ডিপার্টমেন্ট চোর?

বিকেলের দিকে অফিসে ফোন করলো দীপা।

রিসিপশনিস্ট শান্তা অবশ্য বলেছিলো, 'আপনার ওয়াইফ।'

শান্তার কথা শুনে প্রথমটায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রায়না সাধারণতঃ অফিসে ফোন করে না। কী এমন ঘটলো?

দুরুদুরু বুকে রিসিভার হাতে নিয়ে কানে লাগাতেই ওপাশ থেকে দীপার কণ্ঠস্বরে আস্বস্ত হয়ে বলি, 'আরে আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!'

দীপা বললো, 'কেন?'

'শান্তা বললো রায়নার কথা।'

'শান্তা কে?'

'আমাদের অফিসের যোগাযোগ মন্ত্রী!'

'ও। তাই বলো। ভয়ের কি কারণ?'

ওপাশে দীপার হাসির শব্দ শোনা যায়।

'খারাপ কিছু না হলে রায়না ফোন করে না। তাই কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম! তো বল তোর খবরা-খবর। তা এতদিন পর হঠাৎ কোত্থেকে?'

'এসেছিলাম দিদির বাসায়। তাই ভাবলাম একবার খবর নিয়েই দেখি লোকটা কেমন আছে!'

'ভালো আছি!'

'ভালো তো থাকবেই। বউ-ছেলে আর চাকরি-বাকরি নিয়ে আছো মহা সুখে!'

'সে আর বলতে!'

'এই শোনো!'

'বল, শুনছি!'

'বিকেলে তোমার কাছাকাছি বাসস্ট্যান্ডে থাকবো। দেরি দেখলে চলে যেও না যেন!'

'আচ্ছা।'

ফোন ছেড়ে দিলাম।

ওয়াল-ক্লকে সময় বেলা সাড়ে তিনটা।

সহকর্মী নিলয় বললো, 'কী এত ফুসুর-ফাসুর করলা গুরু? নিশ্চই ভাবির ফোন না! কে?'

দীপা।'

'এদ্দিন পর কোত্থেকে?'

'ঢাকাতেই আছে।'

'মাতারি এহনও তোমার পিছন ছাড়লো না দেখতাছি!'

'আমিও তো তাই বলি!'

তারপর বললাম, 'আরে দু'জন দু'জনকে ছাড়লেই না ছাড়াছাড়ির কথা আসবে! কে আর কাকে ছাড়ছে?'

'তুমি পারোও! কিন্তু গুরু, আমি চিন্তা কইরা পাই না! ঘর-বাইর তুমি সামলাও ক্যামনে?'

'এমন হলে তুইও পারবি' বলে, টেবিলে এসে বসতেই কন্ট্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ার খাঁন সাহেব এসে বললেন, 'মমিন সা'ব আপনের কম্পিউটার চালু আছে তো?'

'জি স্যার।'

'তাড়াতাড়ি পিডি সা'বের ড্রয়িংটা বার করেন। দুইটা কারেকশান আছে। আজকেই দিতে হবে!'

এ ভদ্রলোকের কারণে ভেতরে ভেতরে খুবই তটস্ত থাকি। কাজের সময় একটু দেরি হলেই উনি এমন শুরু করেন যে, জানা ব্যাপারগুলোও গুবলেট হয়ে যায়। তাই উনার ফাইল সবসময় ডেস্কটপেই রাখি। বলা মাত্রই বের করতে যাতে অসুবিধা না হয়। ড্রয়িং ওপেন করতেই খাঁন সাহেব তাঁর হাতে ধরা কপিটা আমার সামনে মেলে ধরে আঙ্গুল দিয়ে মার্ক করে বললেন, 'এই যে বাস-বে আছে না, এটা আরো তিরিশ মিটার ডানে সরায় দেন!'

কথামতো দু'মিনিট সময় নিয়ে কাজটা করলাম।

'গুড!'

কাজ দেখে সন্তুষ্ট হলে তাঁর মুখ দিয়ে শব্দটা ঘন-ঘন বের হয়।

তারপর মনিটরে ড্রয়িংটার আরেকটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এই ডিজাইন লেভেলটা কমিয়ে ইলেভেন পয়েন্ট টেন করে দেন।'

আমি টেক্সট এডিট কমান্ড দিয়ে সেটা চেঞ্জ করে দিলাম।

'ভেরি গুড! এবার প্রিন্ট দিয়ে দেন!'

অটোক্যাডে প্রিন্টের ব্যাপারটা মোটামুটি ঝামেলার ব্যাপার। সেটআপ ঠিক মত করতে না পারলে সঠিক স্কেলে প্রিন্ট পাওয়া যাবে না। এটার ওপর মোটামুটি এক্সপার্ট হতেই হবে। আমার কাছে এসব খুব একটা অসাধারণ কিছু বলে মনে হয় না। এই সফ্টওয়্যারটা বাজারে প্রচলিত একটা বাংলা বই দেখে খুব অল্প দিনেই কাজ চালানোর মত শিখে নিয়েছিলাম। পরে কাজ করতে করতে আজ অবধি একটু একটু করে শিখছি।

খাঁন সাহেব প্রিন্টআউট নিয়ে চলে যেতেই এ্যাকাউন্টেন্ট এসে বললো, 'মমিন ভাই, এক্ষুনি একটু উপরে আসেন!'

বললাম, 'কী এমন জরুরী ব্যাপার?'

'এ মাসের হিসেবটা আজ আমাকে শেষ করতেই হবে! বেশিক্ষণ না, ঘন্টা খানেক হেল্প করবেন!'

তাকে বললাম, 'আপনি যান, ফাইলটা ক্লোজ করেই আসছি!'

'এক্ষুনি আসেন!'

এ্যাকাউন্টেন্ট ফের উপর তলায় উঠে যায়।

আমি জানি যে, তার সাথে বসলে অন্তত দেড় ঘন্টার আগে ওঠা যাবে না। হাতে সময় আছেও কেবল দেড় ঘন্টা। দীপার আসার সময়টা অবশ্য একটু দেরি হবারই ইংগিত বহন করে। আচ্ছা দেখা যাক এ্যাকাউন্টেন্ট-এর পেছনে কতটুকু সময় লাগে!

ফাইল ক্লোজ করে কম্পিউটার অফ করে দিয়েই দোতলায় উঠি। কিন্তু সেখানে কী যে ঝামেলার ব্যাপার। শুয়োরের বাচ্চা পুরো টেবিল জুড়েই কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছে। আমাকে দেখে বললো, 'ভয়ের কিছু নাই মমিন ভাই! ওগুলো আপনাকে দেখতে হবে না। আপনি বরং এই স্প্রেড-শিটটায় যোগগুলো ঠিক আছে কিনা চেক করে ছেড়ে দেন!'

শুয়োরের বাচ্চাটাকে থ্যাঙ্কস দিয়ে কাজে বসে গেলাম। খুব বেশি ঝামেলা নেই। কেবল এক টাকার কয়েকটা গরমিল পাওয়া গেল। সেটা তাকে দেখাতেই বললো, 'ঠিক আছে ওই চেঞ্জটা আমিই করেছি। তাহলে বোঝা গেল মন দিয়েই চেক করেছেন। মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ!'

উত্তরে মনে মনে আবার বলি, শুয়োরের বাচ্চা!

ঘড়ি দেখে কিছুটা হতাশ হই। সোয়া পাঁচটা বেজে গেছে। অন্যান্যরা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে অফিস ছেড়ে। খাঁন সাহেব যেতে যেতে বললেন, 'কী মমিন সা'ব, এম্নি এম্নি বইসা থাকলে তো ওভার টাইম পাইবেন না!'

বললাম, 'ওভার টাইম নেবো না স্যার। এক্ষুনি বেরুচ্ছি!'

দুর থেকেই দীপাকে দেখতে পাই। সাদা পোশাকে তাকে মনে হচ্ছে একটুকরো শুভ্র মেঘ চলতে চলতে ঝুপ করে হঠাৎ মাটিতে নেমে পড়েছে। এমন তুষার শুভ্রতা ওকে যেমন মানিয়ে গেছে আবার পুরোপুরি কালো পোশাকেও সুন্দর মনে হয়। আমার মনে হয় সব পোশাকেই ওকে ভালো লাগে। অন্যেরা কি বলবে বলতে পারি না। তবে এপর্যন্ত কোনো রঙের পোশাকেই আমার চোখে তাকে অসুন্দরী মনে হয়নি।

পেটের কাছে একটা হাত দিয়ে আরেকটা হাত আড়াআড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে দীপা। ঠোঁট দুটো ওর এমনিতেই সুন্দর। তাই লিপস্টিক ছোঁয়ানোর দরকার পড়ে না। অবশ্য প্রথম দিকে আমিই বলেছিলাম কথাটা যে, তোর ঠোঁট তো এমনিতেই চমৎকার! শুধু শুধু রঙ লাগানোর দরকারটা কি শুনি? এটা ও নিজেও জানে। আর তাই আমার কথা শেষ না হতেই ওড়না দিয়ে ঘঁষে ঠোঁট দুটো মুছে ফেললো। কিন্তু পুরোপুরি রঙ গেল না। তবে সৌন্দর্য আরো বেড়েছিলো কিছুটা। এখনো তার ঠোঁট দেখে আমার তেমনি একটা ব্যাপার বলে মনে হলো।

আমাকে দেখে দীপা কিছু বললো না। ভালোমন্দ জিজ্ঞাসার জবাব পেলাম না। বুঝতে পারছি আজ কোনো কিছু নিয়ে আমার সাথে তার ঝগড়া করবার ইচ্ছে আছে। দু'টো টিকেট কেটে বাসে উঠে পড়লাম।

সারাক্ষণ আমিই কথা বলে যাচ্ছি, দীপা কিছু বলছে না। ততক্ষণে বাস বনানীর কাকলি স্টেশনে চলে এসেছে। আমি উঠে বললাম, 'চল, এখানেই নামি!'

ও নিরবেই নেমে আসে।

তারপর অটোরিকশায় চড়ে আমরা গুলশানের ওয়ান্ডার ল্যান্ডের সামনে এসে আপাতত নেমে যাই। টিকেট কাটবার আগে বলি, 'পার্কে ঢুকবি?'

এবারও দীপার মুখে কথা নেই। তবে টিকেট কাটলাম দু'টো।

তারপর তার একটা হাত ধরে গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ি পার্কের সীমানায়।

বুঝতে পারছি তার এই নিরবতার কী কারণ। আমি দেখেছি যে, ওর রাগটা সব সময়ই একপেশে। আমার দিক থেকে কোনো রকম ত্রুটি হয়নি। হলে ও-ই করেছে। আমার সাথে এতদিন কোনো রকম যোগাযোগ রাখেনি। আমার রাখবার তো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া ও আমাকে চিঠি লিখতে পারতো। কিন্তু এ পর্যন্ত তাও করেনি।

লেকের পাশে তেমন ভিড় নেই। একটু দুরে ফাঁকা জায়গা দেখে সিঁড়ির দু'ধাপ নেমে দীপার হাত ছেড়ে দিয়ে বসি। তাকিয়ে দেখি তার মুখ থমথমে। কান্না-টান্না শুরু করলেই বিপদ! বলি, 'তা এদ্দিন পরে হঠাৎ? আমি তো ভেবে ছিলাম বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হয়ে গেছিস। বাচ্চা-কাচ্চা হলেই খবর বার্তা পাবো!'

সঙ্গে সঙ্গেই দীপা দুম করে আমার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়।

কিলে জোর ছিলো। ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠতেই বেশ কিছু নারী-পুরুষ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় আমাদের দিকে। ঘুরে দীপার মুখোমুখি হয়ে বলি, 'কিল মারলি কেন?'

'বদমাশদের মত কথা বলছিলে কেন?'

'তুই চুপ করে আছিস যে তাই। কেন? তোর দাঁতগুলোয় কি পোকা ধরেছে? কথা বললে কালো দাঁত সব বেরিয়ে পড়বে?'

দীপা এবার না হেসে পারে না।

আশঙ্কা মুক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কোথায় ডুব মেরেছিলি? আর এদ্দিন পর কি মনে করে? আমার ফোন নাম্বারই বা পেলি কোথায়?'

'আস্তে, আস্তে!'

দীপা দু'হাত তুলে থামানোর ভঙ্গি করলো।

তারপর বললো, 'এক সাথে অতগুলো জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া যাবে না। এক এক করে দিচ্ছি!'

'তা-ই কর!'

দীপা হাতের আঙ্গুল ধরে বললো, 'এক নাম্বারে- এতদিন ডুব দিয়ে থাকবার কারণ হলো, রমলার হাজবেন্ডের সাথে দেখা হচ্ছিলো না। তাই তোমার কোনো খোঁজ-খবর পাচ্ছিলাম না। তারপর দুই নাম্বার, দু'বছর হয়ে গেলেও তোমার দেখা পাচ্ছিলাম না। দেখবার খুব ইচ্ছে হলো। তিন নাম্বার হলো, রমলার হাজবেন্ড রবিন দা' দিন পনের আগে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলো। তার কাছ থেকেই পেয়ে গেলাম তোমার ফোন নাম্বার!'

'আমার দেশের বাড়ির ঠিকানা জানতিস, চিঠি দিলেই তো হতো!'

দীপা মুখ ভেংচে বললো, 'চিঠি দিলেই হতো! আর তোমার বউ সে চিঠি পেয়ে কুরুক্ষেত্র বাঁধাক!'

তার অহেতুক ভীতি দেখে বলি, 'সে তো সবই জানে!'

'তাই?'

‘চোখ বড়বড় করে তাকায় দীপা।

বলি, ‘হ্যাঁ। বলেছি সব!’

‘রাগ করেনি?’

‘কেন রাগ করবে? রায়না মুর্খ মেয়ে-মানুষ না। আর সংসারের বাইরের ব্যাপার নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই!’

‘অদ্ভুত তো! আমি হলে ঈর্ষায় জ্বলে যেতাম!’

‘অদ্ভুত না বলে বল বুদ্ধিমতি! প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে!’

‘তাই তো দেখছি!’

‘তো বল তোর খবর! পরীক্ষা দিয়েছিলি, রেজাল্ট কি?’

‘রেজাল্ট বেরোয়নি।’

‘তাহলে কি করছিস এখন?’

‘বলতে গেলে কিছুই না।’

‘তাহলে চলে কি করে?’

‘বোনদের কাছ থেকে চাঁদা তুলি। তারপর মা-বেটিতে খাই। বাকিটা চলে যায়!’

‘কেমন করে? তাই তো জানতে চাচ্ছি!’

‘চার্চ হসপিটালের রিসিপশনে বসি সপ্তাহে দু’দিন। মাসের পর যৎসামান্য সম্মানী দেয়। মাঝে মধ্যে এক্সট্রা ওয়র্ক হিসেবে বিভিন্ন ক্যাম্পিঙে যাই। তাতে খাওয়া খরচ চলে আর কিছু উপরিও পাই!’

‘ক্যাম্পিং কেন? সংসারী হবি না?’

‘মাকে দেখবে কে?’

‘মা তো সারা জীবন থাকবে না! তখন কি হবে?’

‘যস্মিন কালে যদাচার! একা মানুষ। কোনোভাবে দিন চলে যাবে!’

‘তোর কোনো বন্ধু নেই? মানে বয় ফ্রেন্ড! যাকে নিয়ে ভবিষ্যতে সংসারী হবি!’

‘হলো আর কোথায়!’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো দীপা।

তারপর আবার বললো, ‘বন্ধু তো আছেই। কিন্তু তাকে নিয়ে সংসার বাঁধার সুযোগ নেই!’

‘আসুবিধাটা কোথায়?’

‘আছে।’

‘কী সেটা বলবি তো, না কি?’

আমার মেজাজ কিছুটা চড়ে গেছে বুঝতে পারছি। তবু যথা সম্ভব নিজকে সংযত রেখে আবার বলি, ‘অসুবিধা থাকলে কি আর সে তেমন বন্ধু হলো? আসলে তুই আমার কথাটাই বুঝতে পারিসনি!’

দীপা নির্বিকার ভাবে বললো, ‘বুঝতে পেরেছি ঠিকই। কিন্তু তোমার জানা উচিত যে, ও বিবাহিত। এক সন্তানের বাপও!’

প্রথমটায় বুঝতে না পেরে বললাম, ‘সে তোকে ভালোবাসলে বিয়েও তো করতে পারে! অবশ্য তুই রাজী থাকলে!’

দীপা হেসে ফেললো। বললো, ‘তুমিও না!...’

কথা শেষ করে না সে। এক হাতে মুখ চেপে হাসতে থাকে।

কিছুটা বোকার মত বললাম, ‘হাসির কথা বলেছি?’

‘না তো কি? আমাকে সতীনের ঘর করতে বলছো?’

আমি এবার হোঁচট খাই। ব্যাপারটায় এমন একটা জটিল দিক থাকতে পারে তা আমার মনেই আসেনি। ভেতরে ভেতরে লজ্জায় ডুবে যাই। সে কারণে বেশ কিছুক্ষন তার সঙ্গে সহজ হতে পারি না। এক ধরনের সংকোচের ভার আমার মাথা হেঁট করে রাখে।

‘কিছু ভাবছো?’

দীপা হাসি থামিয়ে বললো।

‘নাহ।’

‘তাহলে মুখটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল যে?’

উত্তর এড়িয়ে যাবার জন্য বললাম, ‘একটা আয়না হলে দেখা যেতো।’

‘আমার ব্যাগে আছে।’ বলে, দীপা তার ব্যাগ হাতালো কিছুক্ষণ। না পেয়ে বললো, ‘নেই। সকালেও ছিলো। যাক বেঁচে গেলে!’

তারপর বললো, ‘ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়াও!’

‘কি খাবি?’

‘তোমার যা পছন্দ!’

‘চল, কি খাওয়াতে পারি দেখি!’

এখানে কোনো খাবারের দোকান নেই। এমন একটা জায়গা যেখানে অহরহ নানা বয়সের মানুষ আসছে। অথচ কোনো খাবারের দোকান দেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে পার্কের বাইরে এসে রিকশা ডাকি।

দীপা বললো, ‘রিকশা বাদ দাও! হেঁটেই যাই!’

তারপর সে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি হাঁটে।

স্ন্যাক্সের দোকানে ঢুকে বললাম, 'বল কোনটা খাবি? পেস্ট্রি, পিজ্জা, হটডগ?'

দীপা আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'ওই যে প্রথম বার শাহবাগে খেয়েছিলাম এর পর আর চান্স পাইনি!'

দীপার কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

বললাম, 'কেন টাঙ্গাইল শহরে পাওয়া যায় না?'

'যায়। তবে এমন স্বাদ নেই!'

'তাই বল!'

'আমি তো ভেবেছি খেতেই পাসনি!'

'অপমান করছো?'

সে গম্ভীর মুখে তাকায়।

বলি, 'ভুল চিন্তা। যেহেতু দুই বছর সম্পর্ক না থেকেও আমাকে ভুলে যাসনি, সেইহেতু আমি তোর প্রিয়জনদের একজন। কাজেই প্রিয়জনের কঠিন ভাষা এমন কি অপমানজনক কথা-বার্তাও অপমানের জন্য নয়!'

'বইয়ের পড়া মুখস্থ বললে নাকি?'

দীপা ফিকফিক করে হাসে।

সেলসম্যান বললো, 'কী দেবো আপনাদের?'

দীপা বললো, 'পেস্ট্রি আর পিজ্জা। সঙ্গে কোক হলে ভালো!'

আমি বললাম, 'বাহ্! তোর পছন্দটা আমার পছন্দের সাথে ঠিক মিলে গেছে!'

'প্রথমদিন তো তোমার পছন্দেই খেয়েছি!'

'অন্য আইটেম বলতে পারতিস!'

'কোনটা?'

'যেমন, হট-ডগ।'

'খাইনি কখনো।'

পিজ্জা চিবোতে চিবোতে কোকে চুমুক দেয় দীপা।

সেলসম্যানকে বললাম, 'হট-ডগ একটা। সাথে ঝাল সজ।'

'না না!'

সঙ্গে সঙ্গেই নাক কোঁচকায় সে।

তারপর বলে, 'নামটা শুনলেই কেমন ঘেন্না-ঘেন্না লাগে!'

সেলসম্যান হতাশ হয়ে বললো, 'তাহলে দেবো না?'

দীপা বললো, 'না না। দিতে হবে না!'

'আমার কাছে এই তিনটা আইটেমই দারুণ লাগে!'

তারপর নিচু স্বরে বললো, 'জানো, আমি যেমন ফকিন্নি, আমার চার পাশের বন্ধুগুলোও ফকিন্নি। এসব খাওয়ার গল্প করলে হা করে চেয়ে থাকে। বলে ওটা আবার কেমন খাবার! সুপ্রিয়া নামে একটা মেয়ে আছে। সে বলে, তোর বন্ধুটা অনেক পয়সাওয়ালা, নারে? তোকে দামী দামী খাবার খাওয়ায়!'

বললাম, 'তখন কি বললি তুই?'

দীপা খাবার মুখে বললো, 'বলেছিলাম, নারে, দাম তো সর্বোচ্চ পঞ্চাশ-ষাট টাকা। নিচে দশ-বারো। ওরা বলেছিলো, আমাদের কাছে তো অনেক দামী। তোর বন্ধুকে বল না আমাদের জন্য একটা পার্টি দিতে। তখন তো তোমার সঙ্গে দেখাই নেই। বলবো কিভাবে?'

আমি বললাম, 'ওরা কি এখনো এসব বলে?'

'নাহ্। সবগুলোর বিয়ে হয়ে গেছে। কেবল আমিই বাকি আছি!'

'বাকি থাকিস কেন? কেউ তো তোকে আইবুড়ি হয়ে থাকতে বলেনি!'

'বলতে হয়! না বললে চলবে কেন? আমার সমবয়সী মেয়েদের মাঝে আমিই সবচে ফকিন্নি!'

কথাটা শুনে আমার খারাপ লাগলো। বললাম, 'তাতে হয়েছে কি। তোর যোগ্যতা, সৌন্দর্য এসব দেখবে না? যে বিয়ে করবে, তার তো কেবল বউ দরকার! না কি আরো কিছু চাই? মানে, যৌতুক-টৌতুক?'

'সবাই কি তোমার মতো দাদা? এমন হলে তো পৃথিবীটা আরো কত সুন্দর হয়ে যেতো। মানুষ তখন স্বর্গে যেতেও রাজি হতো না!'

'তুই মাঝে মধ্যে কী যে বলিস বুঝতে পারি না!'

'কোনোদিন কি বুঝতে চেয়েছিলে? আর বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করনি, বলো?'

আমি জবাব দিলে কথাটা বাড়তেই থাকবে। তাই বললাম, 'বিল দেবার চুক্তি করেছিলি। দিবি?'

তারপর আবার বললাম, 'আচ্ছা থাক! তুই অন্য খাবারের বিল দিস। এখন আমিই দিয়ে দিচ্ছি!'

দীপা আমার হাত টেনে ধরে বললো, 'ভালো হবে না বলছি!'

বললাম, 'তুই আজকে যত ধরনের ভাড়া লাগবে দিস। খাবারেরগুলো আমি দেবো!'

‘না। খাবারের বিল সব আমার। ভাড়া-টাড়া তুমিই দিও!’

বিল দিয়ে বেরোতেই দীপা আবার একটা হাত অধিকার করে নিল। বললো, ‘মা প্রায়ই তোমার কথা বলে। তুমি আরেক দিন আসো না আমাদের বাড়ি! মা খুব খুশি হবে!’

‘তা তো প্রতি ছুটির দিনেই ভাবি একবার যাই। কিন্তু কোথাও যাবার নাম করলেই চরদিক থেকে অদ্ভুত সব কাজ এসে হাজির হয়। সব ভুলে যাবার ভান করতে হয়। আগে চাকরি। তারপর অন্য কাজ!’

আমার হাতটায় আলতো ঝাঁকি দিয়ে বলে দীপা, ‘সুযোগ বুঝেই যেও। তোমাকে তো এক্ষুনি জোর করছি না!’

‘যাবো রে, যাবো! সত্যি বললে মন খারাপ করবি না তো?’

‘বলই না!’

‘মাঝে মাঝে ভাবি, তোকে বুঝি ঠকালাম! ঠকালাম নিজকেও!’

‘তোমার মাথায় এমন চিন্তা আসে কেন?’

‘কেন আসে, সে তো তুইও বুঝিস! একা ঘরে এক সাথে পাশাপাশি থেকেও কেন আমাকে ছুঁতে পারিসনি। পারলাম না তোর ওপর অসুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে। কেন পারলাম না নিজের কামনা আর রিরংসার কাছে হেরে যেতে? এ অর্থে জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটির শত কণ্যা ধর্ষকটার মত বেজন্মা হতে পারিনি। সেদিন ইচ্ছে হয়েছিলো মুখ চেপে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ি তোর ওপর। মনে ভয় আর ঘৃণা ঢুকিয়ে দেই আমার সম্পর্কে। কিন্তু পারিনি! আর কেন পারিনি জানিস?’

দীপা চোখ তুলে তাকায়। কিছু বলে না।

আমি তার জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করে বলি, ‘পারিনি এই জন্য যে, তুই কত নির্ভয়ে আমার কাছে মধ্যরাতে বসে আছিস। মনে নেই কোনো পাপ বোধ। এমন ভয়ও নেই যে, অন্যে দেখলে তোর দুর্নাম রটতে পারে। শুধু শুধু সমাজের চোখে ছোট হয়ে যাবি। যার বিশ্বাস এতটাই অনড়, তাই সে বিশ্বাসটাকে নষ্ট করতে চাইনি। তখন বাচ্চাদের মত করে তোকে খুব আদর করতে ইচ্ছে হয়েছিলো!’

‘আশ্চর্য!’

হঠাৎ মাঝ পথে দাঁড়িয়ে আমার চোখে চোখ রাখে দীপা।

তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে বললো, ‘আশ্চর্য!’

বললাম, ‘কী আশ্চর্য-আশ্চর্য করছিস?’

‘বলছি এই জন্য যে, মানুষের চিন্তায় এত মিল হয় কি করে? তাও আবার পাশে বসে থেকে?’

আমি ঠিক ধরতে পারছিলাম না দীপা কি বলতে চাচ্ছে। তাই চুপ করে থাকলাম।

‘আমিও ঠিক সেই ধরনের চিন্তাই করছিলাম তখন। আবশ্য আমার চিন্তাটা আমাকে ঘিরেই। তেমন ফেরোশাস কিছু না!’ বলে, দীপা হেসে ফেললো।

সরল সোজা। বোকা-বোকা হাসি।

আমার খুব ভালো লাগছিলো। ইচ্ছে হয় নতুন করে আবার তার প্রেমে পড়ি। পে-টোনিক। নিষ্কাম। যে প্রেমে কোনো তাড়না নেই। যন্ত্রনা নেই। বঞ্চনা-ব্যর্থতার ভয় নেই। এমন নিটোল প্রেম। নদীতে নিয়াইয়ের সময় যেভাবে জোছনা লুটিয়ে পড়ে স্থির পানির ওপর। সেভাবে পরস্পর পরস্পরকে লুটিয়ে দিতাম সবুজাভ প্রেম।

আবাসিক এলাকার ভেতরে গাড়ি-রিকশার তেমন ভিড় নেই।

আমরা দু’জন হাঁটছি পাশাপাশি। মন থেকেও কোনো তাড়া অনুভব করছিলাম না। দীপাকে বললাম, ‘কিরে, খুব সুখ-সুখ ব্যাপার মনে হয়?’

তারপর চেয়ে থাকি তার মুখের দিকে উত্তরের প্রত্যাশায়।

দীপার মুখে হাসি দেখা গেল। বললো, ‘সুখ না তো কি? যে সুখি হতে জানে, সে অল্পতেই সুখি হয়!’

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই বললাম, ‘তোকে তো বলা হয়নি!’

‘কোনটা বলা হলো না?’

আমার দিকে ফিরে মুখ তুলে তাকায় দীপা।

‘তোর জন্য একটা বাংলা বাইবেল কিনেছিলাম। দেয়া হলো না!’

দীপা কিছু বলার আগেই আবার বলি, ‘কথা ছিলো আবার এলে তোকে লালবাগের কেল-া, আহসান মঞ্জিল ঘুরিয়ে দেখাবো। তাও হলো না। চেয়েছিলাম তোকে রায়নার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। হলো না। পার্বত্য চট্টগ্রাম কক্সবাজার নিয়ে ঘুরিয়ে আনবো। হলো না। এখন তো দেখছি কিছুই হলো না!’

‘সব কাজ কি সব সময় হয়? হয় না। এই দেখ না, ইচ্ছে ছিলো ঢাকায় থেকে লেখাপড়া করবো। মাসে দু’একবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ভালো কোথাও চাকরি নেবো। কই? কিছুই তো হলো না!’

তারপর আবার বললো, 'তোমার কি এসব ভেবে মন খারাপ হয়? আমার একটুও হয় না। সব ব্যাপারই প্রভুর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। যা হবার হবে। সামর্থ থাকলে লড়াই করবো। জয়ী না হতে পারলে শহীদ হবো। পালিয়ে যাবো না!'

বললাম, 'তুই ঢাকায় আছিস ক'দিন?'

'কাল ভোরেই তো চলে যেতাম। দিদি বললো দু'দিন থেকে যেতে। সে আর তার হাজবেন্ড যাচ্ছে বিক্রমপুর। দু'দিনের জন্য।'

তারপর অকস্মাৎ দীপা আমার দিকে ফিরে বললো, 'আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়?'

'কী কাজ?'

আমি তার জবাবের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকি।

'তুমি কাল পরশু ছুটি নাও। দুটো দিন কাছাকাছি থাকি!'

বললাম, 'দু'দিন তোর কাছে? আমার বউ-ছেলে রেখে?'

'হ্যাঁ।'

নির্বিকার ভাবে বললো দীপা।

তার হাব-ভাবে মনে হলো যে, ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি কি বলবো, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে দীপা বললো, 'বউ-ছেলের কাছে তো প্রতিদিনই থাকছো। দু'দিন আমার কাছে থাকলে তোমার বউয়ের কি এমন কম পড়ে যাবে?'

তার চোখে-মুখে রাগের আভাস ফুটে উঠলো।

তারপর মুখ বাঁকা করে বললো, 'তোমার কারবারে মনে হচ্ছে তোমাকে ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাচ্ছি!'

মনে মনে বললাম, আমি রাজি! তবে, তাকে বললাম, 'না, তা ভাবছি না!'

'তাহলে ভাবছো কি?'

হেসে বললাম, 'মেয়েদের যেমন সতীত্ব আছে, তেমন ছেলেদের সতীত্বেরও একটা ব্যাপার আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একজন বিবাহিত পুরুষ নিজের ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও রাত কাটালে তার সতীত্ব রক্ষা হয়েছে কিনা?'

'সমাজপতি তো মেয়েরা না! কাজেই ছেলেদের তেমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না। একবার কি ভেবে দেখেছো যে, আমাদের দেশের প্রাইম মিনিস্টার

একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও দেশে নারী নির্যাতন কমেনি? নারীরা তাদের পুরোপুরি অধিকার পায়নি? মেয়ে পুলিশ, মেয়ে ড্রাইভার, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মেয়েরা নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময়ও ছেলেদের বাক-নির্যাতনের শিকার হয়! সরকার কিছু করতে পারে না। কাজেই ইজ্জত বলো সম্ভ্রম বলো, পর্দা কিংবা সতীত্ব সবই মেয়েদের জন্য তোলা আছে। যত নষ্টামি-ভন্ডামি আর উশৃঙ্খলতা হচ্ছে ছেলেদের একচেটিয়া!'

দীপা কি বলছিলো তার পুরোপুরি আমার কানে ঢুকছিলো না। ভাবছিলাম, দু'দিন ছুটি ম্যানেজ করা খুব কঠিন হয়ে যাবে! তবে চিফকে খুব করে ধরলে অবশ্যই ছুটি পাবো। বিশেষ কিছু কাজ আছে। সেগুলো আগামীকাল সকাল এগারোটার মধ্যেই শেষ করা যাবে। এখন সমস্যা হচ্ছে আমার বউ রায়নাকে কী করে ম্যানেজ করি!

দীপা তার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে বললো, 'ওসব ধানাই-পানাই বুঝি না! ছুটি নিতে হবে!'

মনে মনে খুশি হলাম এই ভেবে যে, ও আমাকে বাধ্য করছে ওর সঙ্গে থাকতে। আর সাথে সাথেই নিজকে একটা পাকা শয়তান, সুযোগ-সন্ধানী আর লোভী শিয়ালের মত বলে মনে হলো। আমার ভেতরে এমন একটা জ্ঞান-পাপী আছে, আগে কখনো টের পাইনি। আড় চোখে তাকাই দীপার দিকে। সে কি কিছু অনুমান করতে পারছে? কারণ, তাকে আমার চিন্তাগুলো পড়তে দিতে চাই না। তাই একটু রস করে বললাম, 'তুই আমার বউ হলে তো জীবন আমার কালি করে দিতিস। ভাগ্যিস তখন তোর বিয়ের সুযোগ ছিলো না!'

হেসে ফেললো দীপা। কাছে এগিয়ে এসে আবার একটা হাত ধরলো। তারপর আদুরে গলায় বললো, 'বউ হলে তোমার অর্ধাঙ্গিনী হয়ে যেতাম। আর তখন জোর করবার সেই জোরটাই যে হারিয়ে যেতো! তোমার উপর জোর খাটানো মানে তো তখন নিজের উপরই জোর খাটানো হতো! তাই না?'

মনে মনে সত্যটা আমাকে মানতেই হয়।

দীপা আমাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে আবার বলে, 'আচ্ছা, তোমার বউ অমন ভাবে কিছু দাবী করে?'

বললাম, 'তা করে না। যথেষ্ট ভালো মেয়ে!'

'তাই?'

দীপার কণ্ঠে কৌতুহল ফুটে ওঠে।

তারপর বলে, ‘ছেলেরা অন্য মেয়ের কাছে নিজের বউয়ের দুর্নাম করতেই পছন্দ করে!’

বললাম, ‘ কেউ কেউ হয়তো তাই করে। কিন্তু তুই জানিস না, ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেলে, আর্কিটেক্ট রফিক আজমের ওখানে বাইশ’শ টাকা বেতনে চাকরি নিলাম। তুই-ই বল, আমি তখন সবে মাত্র বাবা হয়েছি। রায়নাকে নিয়ে মোহাম্মদপুরে এক ভাড়া বাড়িতে উঠলাম। এগার’শ টাকায় কবুতরের খোঁপের মত একরুমে থাকি। বাকি এগার’শ টাকায় আমাদের সংসার চলে? আমাদের ছেলে রকেটের তখন ছ’মাস বয়স। বাইরে খোলা আকাশের নিচে বস্তির বিচিত্র পেশার লোকজনের পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী দু’জনে গোসল করেছি। প্রায় না খাওয়ার মত করে থেকেছি। অথচ ওর বাপের বাড়িতে এমন অবস্থার কথা কল্পনারও বাইরে। রায়না ছিলো বলেই সেই দিনগুলোতে আমাকে ভেঙে পড়তে দেয়নি। সাহস দিয়ে, হাসি-খুশি থেকে, শক্তি আর মনের বল জুগিয়েছে। তুই হলে পনের-বিশ দিনের মাথাতেই আমাকে ছেড়ে যেতি!’

‘না গো না! আমাকে এত স্বার্থপর ভেবো না! মেয়েরা ভালোবাসার জোরে অনেক কিছু পারে! আমার তো হিংসে হচ্ছে। ইচ্ছে হয় এক্ষুনি গিয়ে তোমার বউটাকে আদর করে আসি আর বলি, মাঝে মধ্যে আমাকে এক আধটু চান্স দিতে!’

এও কি সম্ভব? তবে শুনতে খারাপ লাগে না। এমন হলে পৃথিবীটা সত্যি সত্যিই স্বর্গ হয়ে উঠবে!

সন্ধ্যা হয়েছে অনেক আগেই। আমরা কেবল পার্ক এলাকাটা কেন্দ্র করেই হাঁটছিলাম। কথার তোড়ে কেউই খেয়াল করিনি। হঠাৎ খেয়াল হলে আগেই দীপা বললো, ‘রাত হয়ে যাচ্ছে। আমাকে দিদির বাসায় দিয়ে এসো!’

বললাম, ‘তোকে বাসায় পৌঁছে দেয়ার মানে কি আমাকে বাসা চেনানো?’

‘সেটাও একটা কথা!’

দাঁত বের করে হাসে দীপা।

বললাম, ‘চল তাহলে!’

‘চলো!’

আমি বলি, ‘অটোরিকশায় যাই! সময় কম লাগবে!’

দীপা মাথা কাত করে সম্মতি জানায়।

একটু অপেক্ষাতেই অটোরিকশা পাওয়া গেল। আমি উঠে বসতেই দীপা আমার পাশ ঘেঁষে বসে।

অটোরিকশা ছুটে চলে।

দীপা হঠাৎ দু’হাতে তার মাথার দু’পাশ চেপে ধরে বলে, ‘মাথাটা খুব ধরেছে!’

তারপর রাত্রিবাসের আগাম শুভেচ্ছা হিসেবেই কিনা, আমার কাঁধে মাথা রেখে বললো, ‘একটু টিপে দাও না! পি-জ!’

বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল।

দীপার বড় বোন অনামিকার সাথে পুরোনো দিনের আলাপ করতেই সময় পেরিয়ে যায়। এদ্দিন পর আমাকে দেখে সে আর তার হাজবেন্ড ছাড়তেই চায় না। বলে কি না, ‘রাতটা থেকে যাও! সকালে একবারে অফিসে চলে যেও!’

বলেছিলাম, ‘তা হয় না।’

দু’জনেই কোরাসে বলে, ‘কেন হয় না?’

‘সকালে বউ-ছেলেকে দেখে বের হবো। রাতে ফিরে গিয়ে আবার দেখবো। এ না হলে যে আমার ঘুম হবে না!’

‘বেশ বেশ!’ অনামিকার হাজবেন্ড বলে, ‘এমন সংসার প্রেমিক আরো থাকা দরকার। নইলে যে সমাজটা টুকরো হয়ে যাবে!’

ঘুম-জড়ানো লাল চোখ নিয়ে দরজা খোলে রায়না। ‘এত রাত হলো যে? আমি তো দুশ্চিন্তায় বাঁচি না!’

‘কী করছিলে?’

এক পাশে সরে দাঁড়ায় সে। বলে, ‘হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!’

হেসে বললাম, ‘চিন্তা থাকলে কারো ঘুম হয়?’

‘জানি না যাও!’

ফোড়ন দেয়ার মত ছ্যাত করে ওঠে রায়না।

তারপর দুপদাপ করে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

বললাম, ‘খেয়েছিলে?’

‘ক্ষিদে পেয়েছিলো খুব! তোমার দেরি দেখে খেয়ে নিয়েছি!’

‘গুড! হাজবেন্ডকে না খাইয়ে খাবো না মেয়েদের এই টেন্ডেন্সিটার তাহলে বিলুপ্তি ঘটতে চললো!’

তারপর বললাম, 'একদিন বলেছি ক্ষিদে পেলেই খেয়ে নেবে। আমার জন্য বসে থেকে আলসারের রোগী হওয়ার কোনো মানে হয় না। পরে রোগ সারাতে আমারই টাকা গচ্চা যাবে!'

ছেলেটা উপুর হয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যে নাকের ওপর চাপ পড়লে শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হতে পারে। এমনটা দেখলেই আমি ওকে চিৎ করে দেই। এখনও তাই করলাম। ঘড়িটা খুলবার সময় দেখলাম রাত একটা-দশ। সাত সকালে উঠেই আবার দৌঁড়াতে হবে অফিসে। কাপড় পাল্টে হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম।

রায়না বললো, 'খাবে না?'

বললাম, 'ক্ষিদে নেই।'

'এখন আমারগুলো কে খাবে? খাবার নষ্ট হতে দেখলে আমার খারাপ লাগে!'

বললাম, 'বাইরে খেয়েছি।'

'বাইরে কেন এত আজে-বাজে জিনিস খাও? এতে কি পেট ভরে? মাঝখান থেকে ক্ষিদেটা নষ্ট!'

তার কপালের মধ্যখানে দু'টো ভাঁজ ফুটে ওঠে।

'এখন খেলে হজমে গন্ডগোল হতে পারে। রিস্ক নিয়ে লাভ নেই!'

'যেদিন দেরি করে আসবে বা বাইরে খাবে, সকালে বলে গেলেই তো পারো!'

'বোকার মতন কথা বলছো কেন? আমি কী করে জানবো যে, ফিরতে দেরি হবে বা বাইরে খেতে হবে?'

বউটার কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্তু মাঝরাতে তর্ক বাঁধানোটা ভালো দেখায় না। তা ছাড়া মুল দোষটাই আমার। ও আমার ওপর রাগতেই পারে! স্বামী যখন রাত দুপুরে ঘরে ফেরে, কোনো স্ত্রীর ভালো লাগবার কথা নয়। লাগেও না। কাজেই ওর রাগ করাটা স্বাভাবিক। বরং প্রেমে গদগদ হয়ে ওঠাটাই হতো অস্বাভাবিক!

'সারাদিন খাটা-খাটুনি আর সঙ্গে আছে তোমার ছেলের দস্যি-পনা। এর মাঝে তুমি যদি ঘরে ফিরতে ইরেগুলার হও, আমি কোনটা সামলাবো?'

রায়না পাশ ফিরে মুখ আড়াল করে শোয়।

একটু চান্স পেলেই তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। হয়তো শুরু হয়ে গেছেও। হাত দিয়ে দেখি সত্যি তাই। চেখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বললাম, 'সরি! রাস্তা-ঘাটে যা জ্যাম! আধঘন্টার পথ পেরোতেই লাগে দেড়ঘন্টা!'

তারপর ওর মাথাটা আলতো করে বুকের কাছে চেপে ধরি। আর সেই সঙ্গে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে, আরো কুকড়ে-মুকরে বুকের নিচে চলে এসে বলে, 'কেন আমাকে এভাবে কষ্ট দাও?'

তার আকুলতা দেখে আমার মনে হলো যে, একে আমি শুধু ঠকিয়েই যাচ্ছি! প্রতারণা করছি প্রতিটি দিন!

'দ্যাখো, আমি তো চেষ্টা করিই যাতে তাড়াতাড়ি ফেরা যায়। কিন্তু কি করবো বলো? চারদিকে এত ঝক্কি-ঝামেলা, রাস্তার জ্যাম। শিডিউল মেনে কি চলা যায়?'

সঙ্গে সঙ্গেই আমার কুটিল মন বলে উঠলো, আমি ঠকাচ্ছি? না ও নিজেই নিজকে ঠকাচ্ছে? সুযোগ পেলেই রাতটাকে অর্থহীন করে দেয়। ঘুমিয়ে গেলে আর ছুঁতে পারি না। হাত ঠেলে সরিয়ে দেয়। মাসে দু'তিনবারের বেশী চান্স পাই না। এই যে আমার দানবীয় ক্ষুধা, সেটার নিবৃত্তি হবে কিভাবে? কয়েক দিন বিরতির পর হঠাৎ শারিরীক সম্পর্ক করতে চাইলে দ্রুত-স্খলন অনিবার্য। যে কারণে পুরুষটি মানসিক ভাবে নিজকে ক্ষমতাহীন ভাবতে পারে। রমণীটি তাকে ভাবতে পারে অক্ষম হিসেবে। আর এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পরকীয়া প্রেম। বেশ্যাসক্তি। সংসারে ভাঙন। যা রোধ করা যে কোনো একজনের পক্ষে অসম্ভব!

আমার মন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো যে, প্রবৃত্তির অবদমন আর নয়। এটা যে শরীর-মনের জন্য ক্ষতিকর, ইদানিং হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছি। অনুভব করতে পারছি, কেন একজন বিবাহিত পুরুষ কিংবা নারী সামাজিক সম্পর্কের বহিরাবরণের আড়ালে-আবডালে অবৈধ সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে? তাই দীপাকে পাবার জন্য আমাকে মিথ্যা কিংবা গোপনীয়তার আশ্রয় নিতেই হবে! এতে করে সংসারের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। স্ত্রী-সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধ, ভালোবাসারও কমতি হবে না। কমতি হবে না তাদের চাওয়া পাওয়ারও।

একটা সিদ্ধান্তে পোঁছুতে পেরে আমার মনে স্বস্তি ফিরে আসে। এতক্ষণ কেমন একটা অস্থিরতার মধ্যে ছিলাম।

সকালের জন্য সংলাপগুলো মনে মনে সাজাতে আরম্ভ করি।

সকালে রায়নাকে বলবো, আজ লাঞ্চ দিতে হবে না। অফিস থেকে বাইরে একটা কাজে যেতে হবে। ঘরে ফেরা সম্ভব না হলে অন্য কোথাও থেকে যাবো। কোথায় যাবো জানতে চাইলে বলা যাবে এখনো ঠিক হয়নি। অফিসে গেলেই জানাবে।

চমৎকার যুক্তি! মন খুশিতে ঢলে পড়ে। ওম্ শান্তি! এখন নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাক!

কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যাওয়াতে মিনিবাসে ঠেলা-গুলো খেতে খেতে মতিঝিলে পৌঁছুলামও দেরিতে।

ডবল-ডেকার বাসটা তখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। দ্রুত টিকেট কেটে লাফিয়ে উঠে পড়ি। মাঝামাঝি অংশের একটা খালি সিটে বসতে পেরে স্বস্তি পাই। পরের স্টপেজ মালিবাগ। ওখানে যেতেই গাড়ি ভর্তি হয়ে গেল। লোকজন বেশি ভাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েই যেতে চায়। কারো কথা শুনতে চায় না। বরং অন্যের অসুবিধা করতে পারলেই যেন বেশি খুশি।

নতুন বাজার বাস-স্টপ থেকে একজন মহিলা উঠলেন। বসার সুযোগ না পেয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন পুরুষদের পাশাপাশি। একেবারে সামনে চালকের পেছনের দেয়াল সংলগ্ন লম্বা সিটে একজন বসার মত জায়গা ফাঁকা আছে। বললাম, 'সামনে যান!'

মহিলা সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ঠেলে-ঠুলে জায়গা করে নিলেন। আর আমাকে যারপর নাই অবাক করে দিয়ে পুরুষদের মাঝে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। আমার বিস্ময়ের কারণ হলো, ভদ্র মহিলার চেহারা আর কাঠামো অবিকল ফাহিমার মতন।

ফাহিমা আমার ক্লাস মেট। ভালো বন্ধুও ছিলো। জগন্নাথে আমরা উনিশ-শো সাতাশির বাংলা অনার্স ক্লাসে ক'জন ছিলাম, যাদের মাঝে নারী-পুরুষ সুলভ স্পর্শকাতরতা খুব কমই ছিলো। কেউ কাউকে কখনো প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে এমনটাও শুনিনি। অথচ যা ছিলো একান্তই স্বাভাবিক। এও ছিলো সে দলেরই একজন। মেধার জন্য যাকে মনে মনে একটু বেশিই গুরুত্ব দিতাম।

আমি সরাসরি তাকিয়ে থাকি সেই ভদ্রমহিলার দিকে। চোখাচোখি হলো। বিষন্ন আর অসুখি দৃষ্টি। অবিকল ফাহিমা। কোনো ভুল নেই। কিন্তু আমাকে দেখে তার মাঝে কেনো পরিবর্তন হলো না। না কি চোখ দু'টো আরো উজ্বল হয়ে উঠলো? মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। লক্ষ্য করলাম তার নাকের অগ্রভাগ

লালচে হয়ে উঠলো। তাহলে কি ফাহিমা আমাকে চিনতে পেরেছে? হয়তো ভেবেছে আমি তাকে চিনতে পারছি না?

আমার প্রচন্ড ইচ্ছে হলো গিয়ে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু আরেক মনে ভাবি, একই চেহারার কত মানুষই তো হয়! মহিলা আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। তা ছাড়া মাথায় স্কার্ফ বাঁধা। সম্ভ্রান্ত বলেই মনে হচ্ছে। ফ্যাশন হিসেবে কে মাথায় রুমাল বাঁধে আর কে শালীনতার প্রতীক হিসেবে তা ব্যাবহার করে দেখলেই বোঝা যায়। আজকাল কত ধরনের প্রতারক বেরিয়েছে তার কোনো হিসাব-কিতাব নেই। ও সত্যিকার ফাহিমা না হলে দু'জনকেই অপ্রস্তু হতে হবে। কী দরকার শুধু শুধু একজনকে অস্বস্তিতে ফেলে? তবে শেষ পর্যন্ত খুব কষ্টে আমার কৌতুহলকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হই।

এয়ারপোর্ট স্টেশনে নেমে গেলেন ফাহিমার মত মহিলা।

দ্বিধান্বিত আমি আবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাই তার নেমে যাওয়ার দিকে। মনে মনে যুক্তি খুঁজি। ফাহিমা হতেই পারে। আমি মাস্টার্স পাশ করতে পারিনি। কিন্তু ফাহিমা সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে অনার্স-মাস্টার্স দু'টোই কমপি-ট করতে পেরেছিলো। আমার ধারনা ও উত্তরা এলাকার কোনো কলেজের টিচার। প্রথম দিকে সে মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের একটি প্রাইভেট মহিলা কলেজে অনারারি লেকচারার ছিলো। এ না হলে বর্তমানে কোনো দামী স্কুলের টিচার হয়ে থাকবে।

ফাহিমার চাকরি করবার খুব শখ ছিলো। ক্লাসে ও প্রায়ই এটা নিয়ে আলাপ করতো। তবে অফিসে কোনো কেরানি বা ছোটো-খাটো অফিসারের কাজ ও পারবে না। ক্লাসে দেখেছি, নির্দেশিত কাজগুলো ও ঠিক-ঠাক মত করছে না। কিন্তু স্বাধীনতা আছে এমন কাজগুলো ভালো মতই করতে পারছে।

মহিলা রিকশা করে চলে গেলেন। কিন্তু কোন দিকে গেলেন বাস ছেড়ে দেবার কারণে বুঝতে পারিনি। শেষটায় ভাবলাম, আমি তো এ রুটেই অফিসে যাই-আসি। মহিলার সঙ্গে অবশ্যই আরো অনেকবার দেখা হবে। যখন নিশ্চিত হবো যে এ ফাহিমাই, তখন কেনো এক সুযোগে জিজ্ঞেস করলেই হবে।

প্রায় সম বয়সী খালা-বোনঝি একসঙ্গে পড়তো। আর খুবই দাপটের সাথে পার করতো তাদের সময়গুলো। বলতে গেলে ক্লাস কামাই করতো না তেমন। আমাদের তৈরী করা নোটগুলো দেখবার জন্য প্রায়ই কাড়াকাড়ি করতো। অথচ নিজেদেরগুলো ছুঁতেও দিতো না। এমন কি আমাদের কারো কারো দেখবারও অধিকারও ছিলো না। আমাদের উপর কেন জানি ওরা বেশ জোর খাটাতে পারতো। কিন্তু আমরা বিশেষ করে আমি কোনো প্রতিবাদই করতে

পারতাম না। বলতে গেলে সে সময়টা কেমন যেন মিইয়ে থাকতাম। ওরা হয়তো আমাদের মেরুদন্ডের অবস্থা মানস চোখে দেখতে পেতো। যার ফলে আপনা আপনিই আমাদের ওপর তাদের এক ধরনের অধিকার জন্মে গিয়েছিলো।

ছাত্রজীবনে মেয়েদের বউ সাজবার ব্যাপারটা খুবই নাড়া দিতো আমাকে। যেখানেই কনে সাজানোর কথা শুনতে পেয়েছি, ছুটে,গেছি উদ্ভ্রান্তের মত। শুধু একটিবার দেখবার জন্য। নববধূর সাজ একপলক দেখলেই আমার কৌতুহল মিটে যেতো। কেন যে এত উন্মুখ হয়ে থাকতাম, অনেক ক্ষেত্রে নিজেও বুঝতে পারতাম না। তবে এটুকু বুঝতে পারতাম যে, কনের সাজে প্রথম বিয়ের আগমুহূর্তে মেয়েদের যে সৌন্দর্যটা ফুটে ওঠে, তা আগে পরে কোনোদিন হবে না। যদিও বিশ্বের সেরা সাজটি তারা দ্বিতীয়বার সাজে, তবুও তেমনটি হবার নয়। এ সৌন্দর্যটার সাথে প্রকৃতিরও যেন একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে।

আমার ক্লাস মেটরা আমার এই ব্যাপারটা জানতো। তাই ফাহিমার খালা সুখির বিয়েতে আমাদের পুরো ক্লাস দাওয়াত করেছিলো। বিয়েটা হচ্ছিলো চাঁদপুরে। নতুন বাজারের কাছাকাছি কোনো এক বাড়িতে। ঢাকা থেকে অনেকটা দুরের পথ বলে আমাদের বন্ধুরা কেউ যায়নি। এমনকি সুখি-ফাহিমার পাশের গ্রামের বন্ধু মোজাহেরও না।

একাএকা সেদিন বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আমাকে আহাম্মক হতে হয়েছিলো। নিজকে তখন খুবই ছোটো মনে হচ্ছিলো। এত বড় একটি অনুষ্ঠানে আমার পরিচিত কেউ নেই। যে দু'জন পরিচিত, তাদের একজনের তো বিয়েই। অন্যজন হয়তো সাজানো গেছানোর কাজেই ব্যস্ত।

বেশ কিছুক্ষণ পর ফাহিমা এসে বললো, 'মমিন, কিছু মনে কোরো না। পি-জ! আমি সুখির কাছে আছি। সাজাবার তেমন কেউ নেই!'

তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ হচ্ছে মমিন মিয়া। আমাদের ক্লাসে পড়ে। ঢাকা থেকে এসেছে!'

সঙ্গে সঙ্গেই মুরুব্বী শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ করে সুখির বাবা, আমাকে ছেঁকে ধরলেন। 'আপনি একা এলেন, আর বন্ধুরা কোথায়?'

আমি পড়ে গেলাম দো-টানায়। কী বলি এঁদের? তবু মিছেমিছি বললাম, 'কথা ছিলো আমি কুমিল-া হয়ে আসবো। আর বন্ধুরা আসবে আলাদা। ঢাকা থেকে কেউ লঞ্চে, কেউ বাসে করে।'

'কিন্তু, কেউ তো এলো না?'

বললাম, 'হয়তো এসে পড়বে! আমার সঙ্গে তো এমনই কথা ছিলো!'

এমন সময় রব উঠলো, 'বর এসেছে, জামাই এসেছে!'

সবাই ছুটলো গেটের দিকে। আমি তখনকার মত হাপ ছেড়ে বেঁচে যাই।

বর আসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়ার পালা শুরু হয়ে গেল। আমাকেও ফাহিমার মামা টেনে নিয়ে খাবার টেবিলে বসিয়ে দিলেন। বললেন, 'ভরা পেটে অপেক্ষা করতে অসুবিধা হবে না!'

তারপর ভদ্রলোক নিজেই থালা এগিয়ে দিয়ে আমার জড়তা ভাঙাতে সচেষ্ট হলেন।

আমার খাওয়ার পালা শেষ হয়েছিলো অনেকক্ষণ। একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলাম। এমন সময় ফাহিমার ছোটো ভাই কিরণ এসে বললো, 'আপু ডাকছে!'

কিরণকে ঢাকায় ওর নানার বাড়িতে কয়েক দিন দেখেছি। লাজুক টাইপের। যথেষ্ট মার্জিত আর ভদ্র ছেলে হিসেবে। আমাদের দেখলে বিনয় দেখিয়ে উঠে যেতো কিংবা পালিয়ে যেতো। আজও তার বিনয় প্রকাশে কোনো রকম ঘাটতি পরিলক্ষিত হলো না।

আমি তার পেছনে পেছনে বেশ কিছু দুর এগিয়ে যাই। একটা উঠোনের মত ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে গিয়ে একটা ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দেয় কিরণ। কিন্তু সে দরজা খোলার অপেক্ষা করে না। আমাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেই নিজের কাজে চলে যায়।

একটা বন্ধ দরজার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বড্ড অসহায় বোধ করছিলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পাই না। এক ধরনের অনিশ্চয়তা সামনে নিয়ে মনে হচ্ছিলো যে, অনন্ত কাল ধরে দাঁড়িয়ে আছি বন্ধ দরজার সামনে। যেন একটি ছিঁচকে চোর অন্ধকার হওয়ার প্রতীক্ষায় কিংবা কাঠগড়ায় দন্ডায়মান আসামী, এজলাসে বিচারকের উঠবার প্রতিক্ষায় প্রহর গুণি।

যেন যুগান্তরের প্রতীক্ষা শেষে অকস্মাৎ ফাহিমা দরজা খুলে বাইরে এসে বললো, 'পুরো সাজাতে পারিনি! তুমি চলে যাবে তাই দেখাচ্ছি! বউ দেখ! কেমন লাগছে?'

ফাহিমার কথা সবসময়ই আমার কানে রোবোটিক বলে মনে হয়। প্রাণ খোলা হাসিও যেন প্রাণহীন। কনে সাজানো দেখার আমন্ত্রণও তেমন রোবোটের কণ্ঠে ধ্বণিত যান্ত্রিক শব্দের মত মনে হলেও আমি কনের সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

বিয়ের সাজে সব মেয়েকে আমার কাছে একই রকম মনে হয়। চমৎকার! অসাধারণ। রূপসী। সুখিকেও ব্যতিক্রম মনে হলো না। আমার দিকে তার বড় বড় দু'টি চোখ আরো বড় করে তাকালো। কিছু বললো না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো যে, সে বলছে, স্টুপিড! এমন অজানা অচেনা পরিবেশে কেউ এমনভাবে আসে? আর বললেই কি হ্যাংলার মত ছুটে আসতে হয়?

আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না। ইচ্ছে হয় একছুটে সবার অলক্ষ্যে বিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসি।

আমার পলায়নী মনোবৃত্তি টের পেয়েই যেন ফাহিমা জিজ্ঞেস করলো, 'খেয়েছো?'

'হ্যাঁ।'

তারপরই যেন সময়টা অকস্মাৎ স্থবির হয়ে পড়ে। ফাহিমা হয়তো বলতে পারছিলো না যে, ঠিক আছে যাও! আমি বলি, 'আচ্ছা, চলি!'

'তুমি যে এসেছো, আমরা খুশি হয়েছি!'

একি সত্যিই, নাকি শুধুই বলার জন্য বলা? তা নিয়ে ভাববার অবসর মেলে না। বন্দী পাখি যেমন মুক্ত হয়ে ডানা মেলে দেয় অপার শূন্যতায়, আমিও তেমনি চুপচাপ পা বাড়াই আমার গন্তব্যে। ভুলে যাই সৌজন্য প্রকাশের কথা। ভুলে যাই শুভ কামনার কথা।

সেদিন ফেরার পথে আমাদের বাসটা হঠাৎ দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়। মানুষ মারা যায়নি। তবে যেখানে বসেছিলাম সেখানে কেউ থাকলে নির্ঘাত মারা পড়তো। দুর্ঘটনা ঘটার কিছু আগেই চৌদ্দগ্রামের কাছে পেছনের সিটে চলে এসেছিলাম।

এম.এ ক্লাসে সুখি আমাদের সহপাঠি হতে পারেনি। ফাহিমাকে পেয়েছিলাম। আশা করেছিলাম ফাইনাল পরীক্ষার আগেই ফাহিমারও বিয়ে হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা আর হয়নি তখন। মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা আমি পুরোপুরি শেষ না করেই গ্রামের বাড়ি চলে আসি। মা-বাবার সঙ্গে থাকি আর জনসেবা করে বেড়াই। এমনি একদিন আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে ফাহিমার হাতের লেখা নিমন্ত্রণপত্র এলো। সঙ্গে একটা চিরকুট। তাতে লেখা-

মমিন,

বিয়ের কার্ড পাঠালাম। তুমি ঢাকায় থাকলে মুখেই দাওয়াত দিতাম। অবশ্যই আসবে।

-ফাহিমা।

কার্ডে লেখা বিয়ের তারিখ তিনদিন আগেই পেরিয়ে গেছে। খামের ওপর পোস্ট অফিসের মোহর দেয়া তারিখ অনুযায়ী এটা বিয়ের দশদিন আগেই পোস্ট করা হয়েছিলো। তাহলে কি ডাক বিভাগের বদান্যতায় এটি পেতে আমার তেরদিন লাগলো?

মনটা সেদিন খারাপ হয়ে গেছিলো। সারাদিন কোনো কাজে মন লাগেনি। কেমন ছিলো ফাহিমার বিয়ের সাজ? যদি দেখা হয় কোনোদিন তাহলে বলবো, তোমার বিয়ের ছবিগুলো আছে না? আমাকে একবার দেখতে দেবে? তখন কি বলবে সে? আর ওদের প্রথম সন্তান ছেলে না মেয়ে? সুখির তো প্রথম ছেলে হয়েছিলো বলে শুনেছিলাম।

বাস আজমপুর ছাড়িয়ে যেতেই পরের স্টেশনে নেমে পড়ি।

তারপর অল্প একটু হেঁটেই পৌঁছে যাই অফিসে। দরজা ঠেলে ঢুকতেই রিসিপশন ডেস্ক থেকে ফোনের রিসিভার উঁচিয়ে হাতের ইশারায় ডাকে শান্তা। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার কানে ঠেকাতেই দীপার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'প্রোগ্রাম ঠিক আছে তো?' বললাম, 'ঠিক আছে।'

'তাহলে অফিস থেকে বেরুচ্ছো কখন?'

'সেটা আমিও জানি না। তুই এখন ফোন রাখ। পি-জ!'

ও পাশে খট্ করে শব্দ হতেই রিসিভার ফেরত দিয়ে শান্তাকে বললাম, 'থ্যাংকস!'

তারপর আমি ছুটলাম আমার টেবিলে। যতটা দ্রুত সম্ভব হাতের কাজগুলো শেষ করে রি-চেক করে নেই। তারপর চীফ-ইঞ্জিনিয়ারের রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে বলি, 'আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়ালাইকুম! কি খবর মমিন মিয়া?'

'স্যার, হাতের কাজগুলো তো শেষ। দু'একদিনের মধ্যে বড় ধরনের কোনো কাজ আমাকে দিচ্ছেন না শুনলাম। তাই দু'দিন আমার ছুটি চাই!'

'ছুটি কেন? তুমি তো ছুটি নাও না! অফিসে বসে হাবিজাবি প্র্যাকটিস করে সময় কাটাও!'

'টাঙ্গাইল থেকে আমার এক বন্ধু এসেছে। এই দু'দিন তার সঙ্গে কাটাবো!'

'বন্ধুটা ছেলে না মেয়ে?' বলে, হাসলেন চীফ।

তারপর বললেন, 'ঠিক আছে! কামালকে জানিয়ে দাও তুমি ছুটিতে যাচ্ছো!'

'থ্যাংক ইউ স্যার!'

ফিরে এসে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কামাল সাহেবকে বললাম, 'দু'দিনের ছুটিতে যাচ্ছি! চীফকে বলেছি!'

কামাল সাহেব বললেন, 'একটা অ্যাপি-কেশন রেখে যাও!'

বললাম, 'এখন সময় নেই! ফিরে এসে দেবো!'

তারপর নিলয়কে বললাম, 'খেয়াল রাখিস! সমস্যা হলে সামালও দিতে হতে পারে!'

'ঠিক আছে গুরু!' বলে, চোখ টিপলো নিলয়।

আমি নিঃশব্দে মাথা দোলাতে দোলাতে ফুরফুরে মন নিয়ে আফিস থেকে বেরিয়ে আসি। আহা কি আনন্দ!

এমন তো আমার সচরাচর হয় না। কিন্তু আজকাল প্রায়ই মনটা মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াতে অস্থির হয়ে ওঠে। ঘর-অফিস মনে হয় জেল-খানা। বউ ছেলেকে মনে হয় ভালোবাসা-স্নেহ নামক একটা নেশা। যেটাতে বুঁদ হয়ে থাকি সারাক্ষণ। ভুলে থাকি আমার যাবতীয় সংকট আর প্রয়োজন। অফিস আর ঘর, ঘর আর অফিস। এর বাইরের দুনিয়াটা আমার দেখা হয় না বহুকাল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "রাঁধার পরে খাওয়া, খাওয়ার পরে রাঁধা, বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।"

খালি ফ্লাটের জানালায় পর্দা সামান্য ফাঁক করে রাস্তার ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলো দীপা। আমাকে দেখেই দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বললো, 'সেই কখন থেকে পথ চেয়ে আছি! এত দেরি করলে কেন?'

'অফিস থেকে বেরোনোর নাম নিলেই কত-শত ঝামেলা! বের হই বললেই তো আর সঙ্গে সঙ্গেবেরোনো যায় না!'

'আচ্ছা ঠিক আছে!' বলে, সিঁড়ি দিয়ে কেমন উচ্ছল কিশোরীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো দীপা।

তারপর ঘরে ঢুকে দরজা ঠেলে বন্ধ করে দিয়েই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেলাম। দীপার কপালটা ঠুকে গেল মেঝের উপর। কতক্ষণ উঃ-আঃ করে আবার আমাকে জাপটে ধরলো।

একটু পর খেয়াল করলাম দীপার কপালের মাঝামাঝি অংশটা ফুলে উঠছে। বললাম, 'খেতে তো হবে। দুপুরে কিছু রেঁধেছিস?'

হাত দিয়ে কপালের ফুলো অংশটা চেপে ধরে দীপা বললো, 'কি খাবে?'

বললাম, 'যা বলবো তাতো পারবি না। ঘরে কি আছে? না কি বাইরে খাবি?'

'বাইরে না। ঘরেই যাহোক কিছু বানিয়ে নেবো। আর কিছু না হলে, ভুনা খিচুড়ি আর ডিম ভাঁজা।'

বললাম, 'সঙ্গে আচার হলে আরো ফাটাফাটি হবে!'

'দেখি আচার আছে কিনা!'

কিচেনে ঢুকে কিছুক্ষণ খুটখাট করে একটা কাচের বয়েম নিয়ে এলো দীপা। বললো, 'পাওয়া গেছে!'

বললাম, 'তাহলে খিচুড়িই হোক!'

তার কপালের ফুলোটা আরো বেড়েছে। ওকি ব্যথা টের পাচ্ছে না? খুশিতে কি এতটাই বিভোর হয়ে আছে? বললাম, 'তোর কপালে শিঙ গজাচ্ছে! বরফ না লাগালে সমস্যা হতে পারে!'

'কিচ্ছু হবে না!' বলে, দু'হাতে আমার কোমর আঁকড়ে ধরে সোফায় শুয়ে পড়লো।

তারপর আমার সার্টের তলায় হাত দিয়ে বললো, 'কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে নেই!'

বহুদিন পর এই প্রথম বারের মত আমরা সজ্ঞানে এতটা কাছাকাছি হয়েছি। এতে আমাদের মনে কোনো সংকোচ বা শঙ্কা হচ্ছিলো না। যে জন্যে আগে থেকে কোনো রকম প্রস্তুতি বা রাখঢাকেরও প্রয়োজন পড়েনি।

আমার বউ-ছেলের কথা মনে পড়ে।

ওরা কি করছে এখন? নিশ্চয়ই মা-বেটা মিলে টিভিতে কার্টুন দেখছে!

হঠাৎ করেই দীপা উঠে আমাকে তার নিচে পেড়ে ফেলে বললো, 'আমার কাছে বসে আমাকে ছাড়া আর কারো কথা ভাবা চলবে না!'

তারপর কেমন উন্মাদিনীর মত মত চুম্বনে-পেষনে-ঘর্ষনে আমাকে অস্থির করে তুলতে লাগলো সে। আমি সম্মোহিতের মত ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকি। শেষ মুহূর্তে আমার চোখে দীপার ঘোলা আর দুর্বোধ্য দু'টি চোখ ভেসে থাকে শুধু।

শরীরের ক্ষুধা যে কত আগ্রাসী আর ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, কিছুক্ষণ আগের দীপাকে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। নিজের চোখে না দেখলে অন্য কারো মুখে শুনলে বিশ্বাস করতাম কিনা তাও জানি না। তবে এমুহূর্তে আমি সত্যিই বিস্মিত।

ভাগ্যিস কাম-কলায় একেবারেই অপটু নই বলে বেঁচে গেছি! তবে, দীপা শাঁসিয়ে বলেছে, 'প্রথমবার বলে বুঝতে পারিনি! খাওয়া দাওয়ার পর আবার দেখবো!' বলে, বাথরুমে ঢুকেছে।

নিজকে খুবই ক্লান্ত আর শ্রান্ত মনে হচ্ছিলো। আমার আর রায়নার দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে এতটা সময় লাগেনি কখনো। কিন্তু আজ যে কী হয়েছিলো, আরেকটু হলে মনে হয় হৃৎপিন্ড ফেটে মরেই যেতাম। দীপার প্রথমবার বলে তাকে আন্ডারএস্টিমেট করা ঠিক হয়নি। আমার বোঝা উচিত ছিলো যে, সবার শারিরীক গঠন এক রকম নয়। চাহিদাও সমান হওয়ার কথা নয়। আর শারিরীক ক্ষমতার ব্যাপারটাও অন্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ না হলে তো এমনটি হবার কথা না। দীপা আর রায়নার গঠন একই ধাতুতে নয়।

দীপা বাথরুমে বেশি সময় নেয় না। সে বেরোতেই আমি সুট করে ঢুকে পড়ি। বলতে গেলে কিছুক্ষণের জন্যে আত্মগোপন করি সেখানে। অনেক্ষণ ধরে শাওয়ার ছেড়ে শরীর ভেজাই। কিন্তু শরীরটা যেন রস-কষ হীন শুকনো কাঠ হয়ে গেছে। যেন আমি একটা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। যতই পানিতে ভিজি শরীরের আভ্যন্তরীন চিমসে ভাব যায় না। আমার দেরি দেখে বাইরে থেকে দরজা ধাক্কাতে লাগলো দীপা।

'আবার ধাক্কাধাক্কি কেন? এই মাত্র না বেরিয়ে গেলি?'

দীপা বললো, 'খিচুড়ির সঙ্গে হাঁস না মুরগির ডিম হবে?'

এই সামান্য ব্যাপারটা কি আমাকে না জিজ্ঞেস করলেই নয়? শরীরের অস্থিরতার জন্য আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। পানিতে ভিজতে ভিজতে বলি, 'তোর যা খুশি কর!'

শাওয়ারের নিচে আরো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকি। ধীরেধীরে শরীরের তাজা ভাবটা ফিরে আসতে থাকে। প্রায় ঘন্টা খানেক পর ফুরফুরে মন নিয়ে বেরিয়ে আসি বাথরুম থেকে।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করছিলো অন্য এক দীপা। মুগ্ধ না হয়ে পারি না। পরনে তার বড় বোনের শাড়ি হবে হয়তো। মোটামুটি দামী বলা যায়। রুপালী-জরির কাজ করা সজে জমিন। সোনালী জরির চওড়া পাড়।

শাড়িটার কি নাম ঠিক বলতে পারবো না। তবে আমার মনে হয়েছে ওটার নাম কাতান। ভেজা তোয়ালে দিয়ে চুল বাঁধা। মনে হচ্ছিলো আবার নতুন করে তার প্রেমে পড়তে যাচ্ছি।

ভূনা খিচুড়ি আর গরুর মাংস আমার সবচে প্রিয়। দীপার সঙ্গে কথা ছিলো ডিম ভাঁজার কথা। কিন্তু খেতে বসে দেখি ডিমের সঙ্গে মুরগির মাংসও আছে। হয়তো আগে রান্না করা ছিলো। এখন গরম করেছে কেবল। তবে, তরকারির গন্ধই বলে দিচ্ছে রান্নাটা চমৎকার! কিন্তু ভাবে প্রকাশ করলাম না। ক্ষিদেও পেয়েছিলো খুব। তাই গো-গ্রাসে গিলতে লাগলাম।

দীপা বললো, 'আস্তে ধীরে খাও, গলায় আটকাবে তো!'

বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। গিলছি সাবধানে!'

শঙ্কিত দীপা হাত নেড়ে বলে, 'তবুও!'

বললাম, 'ঠিক আছে! আমি আস্তেই খাচ্ছি!'

খাওয়ার গতি কমিয়ে দিলাম।

দীপা বললো, 'রান্না কেমন হলো বললে না তো!'

'মন্দ না!'

দীপা কিছুটা রাগত স্বরে বললো, 'এই, ফাজলামো করবে না বলে দিচ্ছি! আমি খারাপ রাঁধি না! তোমার চেহারা আর খাওয়ার ধরনটাই বলে দিচ্ছে রান্না ভালো হয়েছে!'

তাকে আরো একটু রাগানোর জন্য বললাম, 'গোয়ালার দই গোয়ালা কখনোই খারাপ বলে না!'

দীপা আচমকা আমার খাবারের থালা টেনে নিয়ে বললো, 'গোয়ালা খারাপ বলে না, না? তাহলে কষ্ট করে আর খেতে হবে না!'

এবার সত্যিই রেগে গেছিলো সে। তাই বললাম, 'সামনা সামনি ভালো বললে লজ্জা পেতে পারিস, তাই চমৎকার কথাটা বলিনি। তাছাড়া...।'

'তাছাড়া কি?'

দীপা জানতে চায়।

'রান্না ভালো বললে মেয়েরা খুশি হয়ে পাতে আরো খাবার ঢেলে দেয়। সেই ভয়ে...!'

দীপা আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'ঠিক আছে! খাও!'

তারপর থালাটা আবার আমার সামনে এগিয়ে দেয়।

কিন্তু তার আচরণে আমার খাওয়ার ইচ্ছে চলে গিয়েছিলো। তাই হাত গুটিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমার পেট ভরে গেছে!'

'থালা টেনে নেয়াতে রাগ হয়েছে বুঝতে পারছি। সরি! আমার এটা করা ঠিক হয়নি!'

'না, না, ঠিক আছে! তোর ব্যবহারে আমি কিছু মনে করিনি। তুই খেয়ে ওঠ!'

'না তুমি খাও। পি-জ!'

'বললাম তো পেট ভরে গেছে!'

'আমার ভুল তো স্বীকার করছি! ভুলের জন্য মাফ চাইছি! নইলে আমিও খেতে পারবো না!'

বললাম, 'ঠিক তো? এমন কাজ করবি না কখনো?'

'না ভাই, এই কান ধরছি!'

সত্যি সত্যিই দীপা তার দু'কান ধরে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়ায়।

'কখনো কারো সামনে থেকে থালা টেনে নিবি না তো?'

'না।'

বল, 'সয়্যার!'

দীপা মুখ কালো করে বললো, 'সয়্যার!'

'দ্যাটস আ গুড গার্ল! এবার হাত নামিয়ে ফ্যাল!'

খাওয়া শুরু করতেই বুঝতে পারি খেতে তেমন ভালো লাগছে না। দীপাও তেমনি আনমনে থালার খাবার নাড়াচাড়া করছে। ছোট্ট একটা ভুলের কারণে এমন সুন্দর একটা পরিবেশ হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে গেল। এভাবে সামনে খাবার নিয়ে বসে থাকা আত্ম-পীড়নের সামিল। আমি পানি খেয়ে উঠে যেতেই সেও থালা বাটি গুটিয়ে ফেলতে শুরু করে।

হাত মুখ ধুয়ে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে টানতে লাগলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাই পুরোটা শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে। সিগারেটটা শেষ না করেই নিভিয়ে ফেলে দীপাকে বললাম, 'আমার খারাপ লাগছে! একটু শুয়ে থাকি!'

দীপার মাঝে কেমন একটা অস্থিরতা জেগে ওঠে। কিচেন থেকে ছুটে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

তারপর শুকনো মুখে আমার বুকে হাত ছুঁইয়ে বললো, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

'সেই খারাপ না! মনে হয় ক্লান্তি। তুই ভয় পাচ্ছিস কেন?'

'ভয় পাবো না বলছো?'

'ভয়ের কিছু হয়নি। একটু রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে!'

দেরি না করে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আর কি আশ্চর্য, দু'চোখ ভেঙে সাথে সাথেই রাজ্যের ঘুম নেমে এলো! চোখের পাতা খুলে রাখতে পারছিলাম না। ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলাম, দীপা আমার পাশে বসে তার মাথা থেকে তোয়ালেটা খুলছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতে পারবো না। ঘুম ভাঙতেই দেখতে পাই আমাকে জড়িয়ে ধরে অঘোরে ঘমুচ্ছে দীপা। মনে হলো দীপা ঘুমুচ্ছে পরম নিশ্চয়তায়। পরিতৃপ্তির গভীর ঘুম। তার ঘুমটা নষ্ট করতে চাইলাম না। কাছাকাছি ঘড়ি দেখতে না পেয়ে সময়টাও জানা হলো না। যেমন ছিলাম তেমনি শুয়ে থেকেই যদ্দুর সম্ভব নড়াচড়া না করে সিগারেট জ্বালিয়ে আস্তে আস্তে টানতে থাকি।

এরই মাঝে দীপা চুকুস করে আমার খোলা বুকে চুমু খায়। ব্যাপারটা আমার বেশ লাগে। তাই তার একটা চোখ বুড়ো আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে চেপে ধরে খুলে বললাম, 'ঘুমোসনি?'

'এমন অবস্থায় কারো ঘুম আসে?'

তারপর সে হঠাৎ সিগারেটটা টেনে ফেলে দিয়ে মল-যোদ্ধার ভঙ্গিতে আমার উপর চেপে ক্রমশঃ দুর্নিবার হয়ে উঠতে থাকে। আমি শঙ্কিত চিত্তে শুনতে পাচ্ছিলাম দুরন্ত সাগরের ফেনিয়ে ওঠার উচ্ছ্বাস।

দ্বিতীয় জলোচ্ছ্বাসে দীপাকে মনে হলো মরেই গেছে! দু'দিকে দু'হাত-পা ছড়িয়ে মাছের মত চিত হয়ে ঘনঘন শ্বাস ফেলছিলো। চোখ দুটো বন্ধ। তবে তির তির করে কাঁপছিলো চোখের পাতাগুলো। বললাম, 'মরে যাবি নাকি?'

দীপা সে অবস্থাতেই হাসলো খানিক। বললো, 'বেঁচে উঠলে তো মরার প্রশ্ন!'

আমি তার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে কি বলবো ভেবে পাই না। অসম্ভব ক্লান্তি লাগলেও মনে হচ্ছিলো এমন একটা ব্যাপার আমার জীবনে খুবই প্রয়োজন ছিলো। এ না হলে বুঝতেই পারতাম না যে, আমার শরীরেও পরিতৃপ্তির একটা দুর্মর বাসনা গুমরে মরেছে এতদিন। রায়না বরাবরই কিছুটা

শীতল প্রকৃতির বলে তার কাছে আমার চাওয়ার পরিমাণটা এমন বেশি কিছু ছিলো না। কিন্তু তার দিক থেকে ব্যাপারটা থাকে দায়সারা গোছের। আচরণটাও এমনি যে, তোমার পাওনা বুঝে যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হও ততই মঙ্গল! কোনোদিন সহযোগীতা পাওয়া তো দুরের কথা, নিজের গরজেই ওকে তাতিয়ে তুলতে হতো। তাও কি উত্তপ্ত হতে চায়! আমার একার আগ্রহে যদ্দুর সম্ভব। প্রতি রাতে আমার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমোতে পারলেই বুঝি খুশি হতো বেশি। কিন্তু শরীরের যে একটা চাহিদা আছে, রায়নাকে পাশে নিয়ে সারা-জীবন শুয়ে থাকলেও টের পাওয়া যাবে না। বরং নিজের চাহিদাও একদিন ভুলে যেতে হবে। অপার ক্লান্তি নিয়ে বসে থাকতে না পেরে আমিও কাত হয়ে শুয়ে পড়ি।

বললাম, 'খুশি হয়েছিস?'

আমাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ রেখেই দীপা বলে, 'হুঁ!'

'যেমন আশা করেছিলি?'

এবার দীপা কোনো জবাব না দিয়ে আমাকে আরো গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরে বুকেরঘ্রাণ নেয় যেন। এভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর সে উঠে এক হাত মাথার নিচে ঠেস দিয়ে কাত হয়।

তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বুকের উপর হাত রেখে বলে, 'আমাকে ভুলবে না তো?'

আমার বুকের ভেতর কিছু একটা ছলকে ওঠে যেন। বলি, 'হঠাৎ এ কথা মনে হলো কেন?'

দীপা মুখ লাল করে বললো, 'কথা না পেঁচিয়ে সোজাসুজি বলো!'

আমি তার গালের ওপর থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে দিয়ে বলি, 'তোকে কি ভোলা যায়, না যাবে?'

আমার বুকের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চাদরের ববলিন টানাটানি করে সে।

তারপর আনত দৃষ্টিতেই বলে, 'আমি ভেবে দেখেছি যে, আমার নান হওয়া ঠিক হবে না! নানদের অনেক কষ্ট! তাছাড়া...!'

'তাছাড়া কি?'

'তোমাকে হারাতে চাই না!' বলে, সে আবার আমার বুকে মুখ গোঁজে।

তার দীঘল চুলের ভেতর হাত দিয়ে বলি, 'আমি হারাবো কেন? আর যদি কখনো হারিয়েই যাই, তাহলে তোর দীঘিতেই হারাবো!'

'এখন তো বলছো এমন কথা, কিন্তু তুমি তো আমাকে তোমার মত করে না পেলে মন থেকে একদিন মুছে ফেলবে!'

বললাম, 'না। তোর ইচ্ছের অবমাননা করবো না কখনো!'

তারপর পরিবেশটাকে তরল করতে আবার বললাম, 'তুই কি আমাকে বিয়ে করতে চাস?'

সে অকস্মাৎ হেসে ওঠে। 'তা কি আর সম্ভব?

'এভাবে মেলামেশা সব ধর্মেই ব্যভিচার! আর ব্যভিচারের পথ ধরে কোনোদিন মঙ্গল আসতে পারে না!'

'তুমি কিছুটা ফ্যানাটিক মাইন্ডের বলেই এটা তোমার কাছে ব্যভিচার!' বলে, দীপা মুখ তোলে।

তারপর আবার বলে, 'আমার মতে দু'জনের নির্মল আনন্দে কোনো পাপ থাকতে পারে না! কিন্তু তুমি তো ধর্ম পাল্টানোকেও ঘৃণা কর। তাহলে তোমাকে বৈধ ভাবে পাবার আর কি পথ আছে?'

'আগে তুই ঠিক কর আমাকে কতটুকু চাস?'

'চাই তো ষোলোআনাই। তবে আমাকে সময় দিতে হবে!'

'আমি কি জোর করছি তোকে?'

'না, তা অবশ্য করোনি! তেমন মানুষ তুমি নও। এতে যদি পাপ হয়, তাহলে সব দায় আমার!'

'পাপ পুণ্যের কথা বলছি না!'

'যাই হোক, আমাকে ভাবতে হবে!'

'সম্রাজ্ঞীর যেমন মর্জি! তবে সারা জীবন এভাবে চলা যাবে না!'

'ভেবে দেখি!'

দীপা আবার শুয়ে চোখ বোঁজে।

আমি প্রকারান্তরে নিঃসঙ্গ হয়ে যাই। ভাবি, দীপার কাছে নানা ভাবে আমার ঋণ বাড়ছে। আর তার কিছুটা হলেও লাঘব করা জরুরি। তাই ঠিক করলাম তাকে দামী কিছু একটা কিনে দেবো। না হলে আমার মন খুঁত খুঁত করবে। আর এ ভাবনার পথ ধরেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতেই পারিনি। ঘুম ভাঙলো দীপার ডাকে। বললাম, 'ক'টা বাজে?'

'দেখে আসি!' বলে, দীপা ভেতরের দিকে যায়।

তারপর খানিক বাদেই ফিরে এসে জানায়, 'সাতটা।'

বললাম, 'সন্ধে হয়ে গেল! তুই ডাকলি না?'

‘এই তো ডাকলাম!’

‘আরো আগে ডাকতে পারতিস!’

‘তুমি ঘুমুচ্ছো দেখে খুব মায়া হলো, তাই ডাকিনি!’

‘সারা দিন তো ঘরেই কাটালাম। বাইরে একটু ঘোরাঘুরি না করলে শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করবে! তুই বের হবি না?’

‘তোমাকে রেখে আমি বাইরে ঘুরতে যাবো? পাগল আর কাকে বলে!’

বললাম, ‘না, তোকে নিয়েই বেরুতে চাই!’

‘তাহলে ব্যাপারটা ভেবে দেখা যায়!’

‘কোনো ভাবাভাবি নেই!’ আমি জোর দিয়ে বললাম।

ওরও হয়তো আগে থেকেই ইচ্ছে ছিলো। তাই মিন মিন করে রাজি হয়ে গেল।

‘গোসল করেছিস?’

‘সেই কখন!’

‘আমি সেরে আসি’ বলে, বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। তাড়াতাড়ি গোসল সেরে দীপা কিছু বুঝে উঠবার আগেই আমি প্যান্ট-সার্ট পরে তৈরী হয়ে যাই।

তারপর তাকে তাড়া দিয়ে বলি, ‘সিম্পল ড্রেসে চল!’

আমার কথা মত সে সালোয়ার কামিজ আর পায়ে চপ্পল গলিয়ে বেরিয়ে দরজায় তালা আটকে দিয়ে বললো, ‘চলো!’

‘সিম্পল বলতে কি এতটাই?’

‘সিম্পল তো সিম্পলই! তার আবার হাফ-ফুল বা কোয়ার্টার আছে নাকি?’

রাস্তায় নেমে রিকশা নেই। ‘নিউমার্কেট চলো!’

দীপা অবাক চোখে তাকায়। ‘নিউমার্কেট কেন?’

বললাম, ‘চল না আগে!’

‘তোমার মতলবটা কি শুনি?’

কেমন সন্দিহান চোখে তাকায় সে।

বললাম, ‘প্যাঁচাল পাড়িস না তো! ওঠ!’

মার্কেটে গিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। দীপাকে যেটাই পছন্দ করতে বলি সেটাই বলে কার জন্য? আমি বলি, ‘তোর!’

সে বলে, ‘নেবো না!’

বলি, ‘কেন নিবি না?’

‘এমনিই!’

‘এটা একটা জবাব হলো?’

‘হলো!’

দীপা দু’হাত তুলে সাফ সাফ জানিয়ে দেয়।

আমিও গোঁ ছাড়ি না। বলি, ‘কিছু একটা নে!’

সে একই ভঙ্গিতে বলে, ‘আমি কিছু নেবো না!’

‘তাহলে আমি পছন্দ করে দেই? না করিস না, পি-জ!’

দীপা কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়ে বলে, ‘আপত্তি নেই! তবে শর্ত আছে!’

‘শুনি, কি শর্ত?’

‘ছোটোখাটো জিনিস। সহজে কারু চোখে পড়বে না।’

মুশকিলে পড়ে যাই। এমন কী আছে যা সহজে চোখে পড়বে না? মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাপলো। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, ‘সহজে চোখে পড়বে না তেমন জিনিস হচ্ছে ব্রা আর প্যান্টি!’

লজ্জা পেয়ে দীপা আমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে বললো, ‘অসভ্য কোথাকার!’

বললাম, ‘আমি নিজে কিছু ঠিক করতে পারছি না!’

পাশে দু’টো মেয়ে কসমেটিক্স দেখছে। দীপার কান্ড দেখে ওরা একবার হেসে উঠেছিলো। তাদের কাছে গিয়ে বললাম, ‘কিছু মনে করবেন না। একটা ছোট্ট হেল্প চাই!’

একজন হাসি মুখেই বললো, ‘বলুন!’

নিচু স্বরে বললাম, ‘আমার উনি ছোটোখাটো কোনো জিনিস নিতে চাইছেন! সহজে চোখে পড়বে না এমন কিছু কি গোল্ডের কিছু হলে ভালো হয়?’

মেয়েটা তার নিজের মাথায় হাতের আঙুলে ধীরে ধীরে টোকা মারে কিছুক্ষণ।

তারপর, ‘সেটা মেয়েলি জিনিসও হতে পারে!’ বলে, খিল খিল করে হেসে উঠলো।

মুখ শুকনো করে বললাম, ‘তাও না!’

‘তাহলে দামী একটা সেন্ট!’

‘ইউরেকা! আপনাকে ধন্যবাদ!’

দোকানিকে বললাম, ‘মেয়েদের ভালো সেন্ট চাই!’

লোকটা অনেকগুলো ছোটো বড় নানা আকৃতির শিশি নামিয়ে দিলো।

সেই মেয়েটা এগিয়ে এসে একটা শিশি দেখিয়ে বললো, 'এটা নিন। প্যারিস থেকে আসে। যে কোনো মেয়ের পছন্দ!'

বললাম, 'থ্যাংক ইউ!'

মেয়েটা বললো, 'না না। ঠিক আছে!'

দীপা মুখ ভার করে বাইরেই দাঁড়িয়েছিলো। গিয়ে বললাম, 'তুই এমন করলি আর মেয়েগুলো আমাকে নিয়ে হাসলো! তোর খারাপ লাগছে না?'

'না!'

'কেন?'

তুমি একটা অসভ্য!'

'সে তো একবার বলেছিস! কিন্তু তোর সমস্যাটা কোথায়, সেটা না বললে আমি বুঝবো কি করে?'

'বুঝতে হবে না! ঘরে চলো!'

বললাম, 'রাগ করিস কেন? তার আগে রাতের খাবারটা একসঙ্গে কোথাও খেয়ে যাই!'

'আমার মাথা ধরেছে!'

আমি বুঝতে পারলাম ওকে আর টলানো যাবে না। বললাম, 'ঠিক আছে, আজকের অপমান আমি মনে রাখবো!'

'তোমার খুশি!'

'ঠিক আছে, চল!'

সারাটা পথ মুখ গোমড়া করে থাকলো দীপা। আমার সাথে একটা কথাও বললো না। আমিও আর ওকে খোঁচালাম না। ঘরে ঢুকে বাইরের কাপড়েই শুয়ে পড়লো। বললাম, 'মাথা ধরলে টিপে দেই!' কিন্তু কাছে গিয়ে কপালে হাত রাখতেই ঝটকা মেরে আমার হাত সরিয়ে দিলো। তাই মনে কষ্ট পাবার ভান করে ড্রয়িং রুমে এসে টিভি অন করে বসে থাকলাম।

বিভিন্ন চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলাম। কোনোটাই তেমন পছন্দ হলো না বলে টিভি অফ করে দিয়ে পুরোনো ম্যাগাজিনে চোখ বুলাই। পড়বার মত কিছু আছে কিনা খুঁজলাম। পেলাম না। নিঃসঙ্গ সময়টা ক্রমশ আমাকে চেপে ধরছিলো। কাজ না থাকলে, নিদেন পক্ষে সময় কাটানোর কিছু না থাকলে আমার খারাপ লাগে।

দেয়াল ঘড়িতে সময় তখন রাত ন'টা পঁচিশ। ভাবলাম আমার বউ-ছেলে এখন কি করছে? তেমন কিছু মনে এলো না। ছেলেটার দুষ্টুদুষ্টু মিষ্টি

চেহারাটা ভেসে উঠলো। এ বয়সে বাচ্চাদের অনেক রকম কৌতূহল থাকে। কিন্তু ছেলেটার কৌতূহল মাত্রাতিরিক্ত। নয়-ছয় বলে কোনো রকম বুঝ দেয়া যায় না। তার যুক্তির সাথে উত্তরের সামঞ্জস্য থাকা চাই। নচেৎ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অস্থির করে তোলে। কম্পিউটারে গেম খেলতে বসে কখনো জিজ্ঞেস করে বসে, ' বাবা, গেম কিভাবে বানায়?' তার বুঝ মতন তাকে বোঝাতে পারি না। বলি, 'সব পড়তে পারলে, বড় হলে তুমিই জানতে পারবে!' তখন তার তাৎক্ষনিক জবাব আসে, 'আমিতো সকালে এ বি সি ডি পড়েছি!' তখন আমার মুখে কথা জোগায় না। বাসায় ফিরে গিয়ে অবশ্যই আমাকে ছেলের মুখোমুখি হতে হবে। আর জবাব দিহি করতে হবে আজকের রাতটার অনুপস্থিতির জন্য। এবং তার যুৎসই জবাব হওয়া চাই!

এখন আমার বউ-ছেলেকে কাছে পেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। একবার মনে হয় বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু মনের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা ভীরু আমি-টা সায় দেয় না। যুক্তি দেখায় যে, দীপা কি ভাববে? এখন চলে গেলে ও হয়তো বলে বসবে প্রয়োজন মিটেছে তাই আর থাকছি না! যদিও দীপার প্রয়োজনে আমি আজ এখানে। তবুও আমার তরফ থেকে কোনো রকম ইচ্ছে ছিলো না বললে মিথ্যাচার হবে। পরকীয়াদুষ্ট আমার মাথা এমনিতেই নিজের কাছে হেঁট হয়ে আসে।

সোফাতে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দীপার ছোঁয়াতে ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলে দেখি আমার পাশেই বসে আছে সে। বললো, 'এখানে ঘুমুচ্ছো কেন? মশা কামড়াবে না?'

এবার আমার রাগ দেখানোর পালা। কিন্তু সত্যিকার ভাবে রাগতে পারি না। তবুও রাগের ভান করে বলি, 'খেলে খাবে! তুই তো মশারি টানিয়েই বেশ ঘুমোতে পারতি! উঠে এলি কেন?'

'না খেয়ে ঘুমুতে নেই! কিছু খাবে, এসো!'

বললাম, 'আমার ক্ষিদে নেই!'

'আমার পেয়েছে!' বলে, হাত ধরে টানে সে।

বললাম, 'তুই খা! আমাকে টানছিস কেন?'

আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'ইস, রাগ কতো!'

'তুই রাগতে পারিস, আমার রাগ থাকতে নেই?'

'তুমি ওই বেহায়া মেয়েগুলোর সঙ্গে অমন হেসে হেসে কথা বলছিলে কেন? আরেকটু হলে তো ওরা তোমাকে পটিয়েই ফেলতো!'

ওর কথা শুনে আমি হা হয়ে গেলাম। বিস্ময় চেপে মনে মনে বললাম, বেচারি! বউ-ছেলে আছে এমন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে পারো, এক বিছানায় শুতে পারো আর অন্যে পটিয়ে নেবার ভয়!

হাসি আর চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, 'তুই আমাকে পটিয়েছিস বলে দুনিয়ার সবাই এমন হবে?'

'তোমাকে নতুন করে পটাতে যাবো কেন? তুমি তো আমারই!'

বোকা মেয়ে! মনে মনে বলি।

তারপর তাকে মুখোমুখি করে বললাম, 'একটা মানুষ কতজনের হতে পারে?'

'সে যত জনকে ভালোবাসতে পারবে!'

তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, সে যা বললো তার শিকড় তার মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে। সেখান থেকে তাকে স্থানচ্যুত করা বেশ কঠিন। আর তা মনে হতেই আমার সমস্ত অভিযোগ তুলে নিয়ে তার চুল মুঠিতে ধরে বললাম, 'বাইরে খেতে বলেছিলাম, তখন না করেছিলি কেন?'

'চুল ছাড়ো! ব্যথা পাচ্ছি না?'

মনে হলো আর একটু হলে কেঁদেই ফেলতো সে।

চুল ছেড়ে দিতেই সে বললো, 'আমার সঙ্গে বেরোলে কক্ষনো কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না!'

বললাম, 'তুই তো খুব হিংসুটনি রে! কবে আমার বউকে ছাড়তে বলিস ঠিক নেই!'

দীপার মুখটা বিষাদে ছেয়ে গেল। বললো, 'তা তো আমি মরে গেলেও সম্ভব না! আর তেমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কোন দুঃখে! কাজেই নগদ যা পাই, তাই আমার অনেক!'

বললাম, 'এভাবে জীবন চলবে?'

'জীবনটা যার কাছে যেমন। তুমি যেভাবে দেখবে জীবন তোমার কাছে তেমন হয়েই ধরা দেবে। আসল কথা, কে কীভাবে তার জীবনটাকে যাপন করবে তার উপরই নির্ভর করছে জীবনের রকমফের!'

তারপর, 'আর কোনো কথা নয়!' বলে, দীপা আমার মুখ চেপে ধরলো।

আমি কিছুটা জোর খাটিয়ে হাত সরিয়ে দিতেই বললো, 'খেতে চলো!'

তারপর টানতে লাগলো ডাইনিং টেবিলের দিকে।

সকাল বেলাতে যখন আমার ঘুম ভেঙে গেল, দীপা তখনো ঘুমুচ্ছে। গত রাতে তার শেষবারের মত ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমাকেও রাত জাগতে হয়েছিলো। কিন্তু ঘুমটা সে হিসেবে খুব তাড়াতাড়িই ভেঙে গেছে। দীপাকে কয়েকবার জাগাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওর ঘুম ভাঙলো না।

বিছানা ছেড়ে জানালার দিকে এগিয়ে যাই। পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখা গেল রাস্তাটাও ঘুমুচ্ছে যেন। লোকজন চলাচল তখনো শুরু হয়নি। দু'একটা রিকশা টুং-টাং বেল বাজিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছে সওয়ারীর আশায়। এ সময়ের রাস্তাটাকে গ্রামের রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা চলে। সেই সঙ্গে মায়ের একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার সারাজীবনই বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস। কোনোদিন খুব ভোর বেলা ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে মা বলতেন, 'ভোরের হাওয়া লাগে গায়, সকল অসুখ দূরে যায়!'

এটা একটা প্রবাদ। না প্রবচন? নাকি খনার বচন? এ মুহূর্তে আলাদা করতে পারি না। বুঝতে পারি ব্রেন তেমন কাজ করছে না। অথচ আমি কৈশোরে খুব একটা রোগা ছিলাম বলা যাবে না। ভালো স্বাস্থ্যই ছিলো।

বেশিক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগলো না। ফিরে এসে দীপার পাশে শুয়ে পড়ি। কিন্তু আমার অস্থিরতা বাড়তেই লাগলো। এক মুহূর্তও ভালো লাগছিলো না। আবার উঠে বাথরুমে ঢুকে গেলাম। একবারে গোসলটাও সেরে নিয়ে বেরোতেই দেখি বিছানায় বালিশ কোলে করে বসে আছে দীপা। বললাম, 'ঘুম কেমন হলো?'

'ওয়ান্ডারফুল! বহুদিন পর আজ নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পেরেছি!'

'সুখবর তাহলে!'

দীপা হঠাৎ চটে উঠে বললো, 'অ্যাই, সক্কাল-সক্কাল মেজাজটা খারাপ করে দেবে না বলে দিচ্ছি!'

'মেজাজ খারাপ করার মত কী এমন করলাম?'

'এখন সাধু! কিছু করোনি, না?'

সত্যি সত্যিই বুঝতে না পেরে বললাম, 'কী করেছি?'

দীপার চোখে মুখে ক্রোধ জমে উঠতেই মনে মনে ভয় পেলাম। সে রাগত স্বরে বললো, 'এত ভোরে উঠতে কে বলেছে তোমাকে? কত্তো দিন পর একখানে হলাম আর উনি পালিয়ে থাকছেন!' বলে, বালিশে মুখ গোঁজে।

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। অভিমান থেকেই এ রাগের সূত্রপাত। তাই পাশে বসে তার মাথায় হাত রেখে বললাম, 'তোর কাছাকাছি থাকবো বলেই তো ছুটি নিলাম। আর পালিয়ে গেলাম কোথায়? তোর কাছেই তো আছি। তাছাড়া অনেকদিন পর টেনশন-ফ্রি ঘুম হলো তো, তাই সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেছে বলে গোসলের কাজটাও সেরে ফেললাম!'

দীপা বালিশ থেকে মুখ তুলে বললো, 'তোমাকে দেখে ঘুমোলাম আর জেগে যদি না দেখতে পাই, কেমন লাগে বলতে পারবে?'

'অবশ্যই খারাপ লাগবে! আমি তো কোনোদিন সকাল বেলাটা দেখতে পাই না। তাই কেনোদিন যদি খুব ভোরে ঘুম ভাঙে, বেশ লাগে। ঠিক তোর রাগের মতন!'

আমার কথা শেষ না হতেই সে আমার ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো গত রাতের মতই। বুকে দুমদাম কিল মারতে মারতে বললো, 'তোমরা ছেলেরা খুবই স্বার্থপর! প্রয়োজন মিটে গেলে আর ফিরেও তাকাও না!'

বললাম, 'তোর কথাটা মানতে পারলাম না। যদি স্বার্থপরই হতাম তোর কথামত আমার এখানে আসাটা উচিত কাজ হতো না। তোর দিকে তাকিয়েই তোর কাছে এসেছি!'

'এসেছো তো তোমার লাভে!'

'আমি স্বীকার করছি! তবে তোর যে কোনো লাভ হয়নি তাও বলতে পারবি না!'

দীপা কোনো কথা বললো না। বললাম, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি মোটেও স্বার্থপর নই। তোর দিকটাও বিবেচনায় রেখেছি। আর সে কারণেই তোর মেজাজ যাতে আবার খারাপ না হয় সে অনুযায়ী কথা বলতে চেষ্টা করছি!'

দীপা আবার আমার কোমর জড়িয়ে ধরে চোখ বুঁজলো। তাকে আলতো ঠেলা দিয়ে বললাম, 'এই, তোর আবার ঘুম পাচ্ছে নাকি?'

'হুঁ। খুব দুর্বল লাগছে গো! মাথাটাও বেশ ভারী হয়ে গেছে!'

বললাম, 'ব্যাথা করছে? টিপে দেবো?'

'না। ব্যাথা নেই!'

'তাহলে উঠে গোসল করে নে! ভালো লাগবে!'

তারপর বোঝানোর ভঙ্গিতে বলি, 'হঠাৎ শরীর থেকে বেশ কিছু সঞ্চিত জিনিস বেরিয়ে গেছে। আর উত্তেজনারও একটা ব্যাপার আছে। সে কারণেই

দুর্বল লাগছে। এখন উঠে পড়। গোসল-টোসল করে হেভি একটা নাস্তা কর ডিম-ডুম দিয়ে! তাহলে ক্ষতিটাও পুষিয়ে যাবে!'

'শুরু হলো তোমার মাস্টারি?'

দীপা উঠে বসে পড়লো।

তারপর বললো, 'আচ্ছা, তুমি কি সব জাগাতেই মাস্টারি করো নাকি? মাস্টারিই যদি করবে তো ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি নিলে কেন? কোনো স্কুল মাস্টার হলেই পারতে!'

'শিক্ষক পৃথিবীর সব জায়গাতেই শিক্ষক। আমাদের প্রজেক্টের একজন এ্যাডভাইজর আছেন। ইঞ্জিনিয়ার। ডঃ আলি আকবর মলি-ক। এক সময় বুয়েটের টিচারও ছিলেন। তাঁকেও আমি একটা প্রোগ্রাম শিখিয়েছি। তবে শিখিয়েছি না যদ্দুর শিখেছি আরো বেশি। শেখার ফাঁকে ফাঁকে অন্যদের কাছ থেকে নতুন কিছু জেনে থাকলে আমাকেও শিখিয়ে দিয়েছেন। সে হিসেবে উল্টো আমিই তাঁর ছাত্র হয়ে গেলাম। কাজেই শিক্ষক তার স্বভাব কখনোই পাল্টাতে পারেন না। ছোটো বেলা থেকেই আমি আমার ক্লাস-মেটদের পড়া বুঝিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু নিজে বুঝতে পারতাম না। ছাত্র ভালো, অথচ পরীক্ষায় অন্যদের চাইতে নাম্বার কম!'

'হয়েছে! আর লেকচার শুনতে চাই না!'

কিছুটা বিরক্ত হয়ে দীপা উঠে যায়।

দীপা উঠে যেতেই মনে হলো কাজ-কর্মহীন এমন দীর্ঘ সময় আমি পার করবো কিভাবে? কাজ ছাড়া আমার দিন কাটতে চায় না মোটেও। একটা মেয়ের সঙ্গে সারাদিন খুনসুটি করে কাটানো আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! বাসায় ছুটির দিনটাও আমার ভালো লাগে না। তবুও ভালো সেখানে সংসার নামক একটা ব্যাপার আছে। আছে তাতে অনেক সমস্যা, বউ-ছেলের নানা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন। টুকিটাকি কাজ। সময়টা ধীরে হলেও কাটে। কিন্তু এখানে কিভাবে কাটাবো? যে মেয়ে তার শরীরের চাহিদা ছাড়া জগতের কিচ্ছু বুঝতে চায় না। এই শরীরী ব্যাপারটার বাইরেও যে আরো ব্যাপার আছে তাকে বোঝালেও বোঝে না। মানুষ নিজকে এত ছোটো একটি বৃত্তে বন্দী করে ফেললে বাইরের আর কিছুই কি তাকে আকর্ষণ করতে পারবে? বাঁচার আনন্দটাই ধরা দেবে না তার কাছে!

তবে মানুষের এই শরীরের ব্যাপারটা বেশিদিন স্থায়ী হয় না বলেই রক্ষা! না হলে একঘেয়েমীতে পেয়ে বসতো তাকে। দীপারও চাহিদাও এমন আগ্রাসী

থাকবে না। ঝিমিয়ে পড়বে এক সময়। যাবতীয় আগ্রহ হারিয়ে যাবে। হয়তো চিরতরেই চলে যাবে তার কাম-স্পৃহা। আর এ কথা মনে হতেই হঠাৎ খেয়াল হলো যে, তার এমন হতেই পারে। কারণ বহুদিন যাবৎ তার প্রার্থিত জনের অভাবে এই ক্ষুধা চাপা পড়ে ছিলো। এখন উপযুক্ত পরিবেশে তা দ্বিগুন পরিমাণে বেড়ে উঠেছে। আমার কারণেই তার এ অবস্থা। সংসারী হলে আর এমন থাকবে না। কিন্তু যদি সংসারী না হয় তাহলে এটা কোনো কঠিন রোগ বিশেষ করে হিস্ট্রিয়ার জন্ম দিতে পারে।

দীপা বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। দেখতে খুবই ভালো লাগছিলো। সকালের ফোটা শিউলির মতই। কে বলে মানুষ একজনেরই প্রেমে পড়ে? আমি তো দেখছি একই সঙ্গে রায়না আর দীপাকে ভালোবাসতে পারছি। মনে কোনো অস্বস্তি হচ্ছে না। নাকি আমি একটা শয়তান?

দীপা বললো, 'কি দেখছো শকুনের মত?'

'তোকে।'

তারপর, 'তোকে আমি সত্যিই ভালোবাসি রে!' বলে, উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত কণ্ঠে বললো, 'তা তো জানিই!'

দীপা আমার কানের লতিতে আলতো একটা কামড় দিয়ে বললো, 'শয়তান! কেবল তুমিই ভালোবাসো, আর আমি ভালোবাসি না?'

সেটা বুঝতে পারি। তাকে আদর করতে করতে বললাম, 'এ ভালোবাসাটা কেমন যেন। মাঝে মাঝে খুব ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু পারি না!'

দীপা হঠাৎ সোজা হয়ে বললো, 'আমারও তো এমন হয়!'

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দীপা আবার বললো, 'আচ্ছা আমাদের দু'জনের কেবল এই একটা দিকেই খুব মিল! কেন?'

এমন প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তাই, চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় মনে করি।

আমার নিরবতাকে সম্মতি ধরে নিয়েই হয়তো দীপা আরো আগ্রহী হয়ে ওঠে। বলে, 'দ্যাখ, সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম যেটাই বলো, এমন কি জাতিগত ভাবেও কোনো মিল নেই। তবে এই মিলটা কেমন অদ্ভুত! তাই না?'

বললাম, 'আমরা দু'জনেই মানুষ বলে এই মিলটা আছে। এটা অদ্ভুত কোনো ব্যাপার না। সৃষ্টির শুরু থেকেই নারী-পুরষের কোনো ব্যাপারে মিল না থাকলে দু'জন দু'জনের কাছাকাছি আসতে পারে না। ভালোবাসা তো

আরো পরের ব্যাপার! শুধু শরীর কেন্দ্রিক সম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না। এক সময় বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য!'

'আবার মাস্টারি?' বলে আমার কানে জোরে কামড়ে দেয় দীপা।

ব্যথাটা সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠি।

দীপা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'সরি! অত জোরে লাগবে বুঝতে পারিনি!'

দীপার মুখ দু'হাতে চেপে ধরে বলি, 'ইফ ইউ লাভ মি, নেভার সে সরি! নেভার সে গুডবাই!'

আমার কথায় বিরক্ত হয়েই বুঝি দীপা এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরলো। আমি তাকে বাধা দিলাম না। ওভাবে আমরা কতক্ষণ ছিলাম বলতে পারবো না। এক সময় হয়তো ক্লান্তিতেই হাত সরিয়ে নিলো সে। সুযোগ পেয়ে বললাম, 'দীপামণি, আমার ডিউটি তো শেষ। এবার আমাকে ছুটি দে!। তোর দিদি দুলাভাই তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে!'

আমার বুকে পাগলের মত মুখ ঘষতে ঘষতে দীপা বললো, 'ছুটি তো দিতেই হবে! তোমাকে তো আর সারা জীবনের জন্য ধরে রাখতে পারবো না! সে শক্তিও আমার নেই। তো মাঝে মাঝে এমনি দু'একদিন সময় দিও!'

তারপর সার্টের কলার চেপে ধরে আবার বললো, বলো, 'দেবে তো?'

দীপার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। মনে হলো, অমন স্বচ্ছ যার চোখ, যার চোখে এত গভীরতা, সে কখনো মিথ্যে বলতে পারে না। চোখ হচ্ছে মনের জানালা। সে জানালায় যা দেখা যায় সেটা ভুল কিছু নয়। তাই ওর দু'গাল ছুঁয়ে বললাম, 'কেন? তোর মনে কি সন্দেহ আছে?'

আমার হাতের পরশে দীপা চোখ বোঁজে।

তারপর আবার বলি, 'আমার ছোঁয়া তোকে কি বলে?'

দীপা চোখ খোলে। বলে, 'সে তো বলে অনেক কিছুই। আবার ভয়ও হয়!'

'না, ভয় করিস না! ভালোবাসলে ভয় হবেই। তাই বলে ভয়ে আধখানা হয়ে থাকতে হবে নাকি?'

দীপা আমাকে ছেড়ে দিয়ে মুখটা নিচু করে সরে দাঁড়ালো। তারপর টলমল চোখে মুখ তুলে তাকায় আমার দিকে। বলে, 'কথা দাও, যখনই ডাকবো চলে আসবে!'

‘সেটা অবশ্যই সময় এবং পরিস্থিতি বিচার করে। না হলে তো একটু সমস্যা হবেই!’

‘সেটা আমিই ভালো বুঝি!’

বললাম, ‘এই তো লক্ষী মেয়ে!’

রুমালে দীপার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম, ‘এবার যাই!’

‘যাই বলে না! আসি বলো!’

দীপার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

হাসি-কান্না একই সঙ্গে। খুব শক্তিশালী আর উন্নত মননের অধিকারী বলেই এমনটা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব!

বাইরে বেরিয়ে এসে উপরে তাকালাম। জানালার পর্দা ফাঁক করে তাকিয়ে আছে দীপা। চোখাচোখি হতেই হাত নাড়লো।

বুকটা আমার কেমন জানি মোচড় দিয়ে উঠলো। গলার কাছে এ্যাডামস অ্যাপলটা কেমন ব্যথাব্যথা করতে লাগলো। ঢোক গিললাম কয়েকবার। কিন্তু ব্যথাটা গেল না।

এই বুঝি প্রেম! অব্যক্ত যন্ত্রণা ভরা! বোঝানো যায় না যন্ত্রণার ধরন। কেবল অনুভূতিকেই চেপে ধরে তার অদৃশ্য সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম জালের ফাঁদে। যাকে ছাড়াতে চাইলেও আরো জড়িয়ে ধরে আষ্টে-পৃষ্টে!

বেলা এগারোটার দিকে প্রেসক্লাবের কাছাকাছি হতেই একটা মিছিলের মুখোমুখি হই। সরকার বিরোধী মিছিল। এসব মিছিলকে আমার ভীষন ভয়! কারণ মিছিলকারীদের কেউ কেউ সশস্ত্র থাকে। কখন গুলি-বোমা ছোঁড়ে ঠিক নেই। আবার সরকারী দলের কোনো ক্যাডার বা পুলিশ গুলি ছুঁড়বে তারও নিশ্চয়তা নেই।

রিকশাঅলা বললো, ‘সা’ব নাইমা যান গিয়া! সামনে যামু না! আমি গরিব মানুষ। কহন রিকশাডা পোড়াইয়া দিবো ঠিক নাই!’

ভেবে দেখলাম, কথাটা মিথ্যে নয়। এসব মিছিলের গুলি-বোমা আর আগুনের শিকার হয় নিরীহ মানুষ। যেগুলোর প্রতিকার সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণা নেই। মিছিলটা এখনো কিছুটা দুরে আছে। অগত্যা নেমে পড়ি। রিকশাঅলার দিকে দশটাকার একটা নোট বাড়িয়ে ধরি। কিন্তু লোকটা মাথা নাড়ে। নেবে না। ধমক দিয়ে বলি, ‘ধরো মিয়া! নাইলে জমার ট্যাকা কোইত্থাইকা দিবা?’

বিস্মিত রিকশাঅলার হাতে টাকাটা গছিয়ে দিয়ে বাম পাশের ফুটপাত দিয়ে পল্টনের দিকে দ্রুত হেঁটে যেতে থাকি।

মিছিল এগিয়ে আসছে ক্রমাগত। হঠাৎ মিছিলের ভিড়ে পরিচিত একটা মুখ চোখে পড়তেই আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। পনের-ষোলো বছরের কিশোর। আমাদের পাড়ার এক পান-দোকানদারের ছেলে। তার হাতে ওটা কি? সূর্যের আলোয় হঠাৎ ঝিকিয়ে উঠলো যেন। আমাকে দেখতে পেয়েই সেটা জামার তলায় কোমরে গুঁজে ফেললো। আমার বিস্ময় কাটে না। এ ছেলে পিস্তল পেলো কোথায়?

পল্টনের দিকে বুম বুম শব্দে কয়েকটা বোমা ফাটলো। আমার ঘোর তখন কেটে গেছে। রায়ট পুলিশ ততক্ষণে মিছিলের সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঢাল তুলে ব্যারিকেড তৈরী করে ফেলেছে। ফলে বাঁধা পেয়ে মিছিলের অগ্রভাগের লোকজন পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করে দেয়।

ওদের মাঝে নেতা কেউ হবে। লোকটা দেখতে বেটে মতন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে। চোখে চশমা। মাথায় টাক। চাপদাড়ি মুখে। ওই ভদ্রলোকই তেজি বেশি। ধাক্কা দিয়ে পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে যেতে চাইছেন। পুলিশ মিছিলের স্রোতটাকে প্রাণ-পণে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে।

অবস্থা নাজুক দেখে রাস্তার লোকজন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক দৌঁড়ে আমাকে অতিক্রম করে যাবার সময় বললেন, ‘আরে ভাই দেখছেন কি? পালান! এক্ষুনি টিয়ার গ্যাস শেল মারবে!’

কোথায় যাবো? কি করবো এখন? বুঝতে না পেরে একটা দোকানে ঢুকতে গেলাম আর অমনি আমার নাকের সামনে দোকানের লোকজন সার্টার নামিয়ে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো। পেছনে দুমদুম শব্দে বোমা অথবা কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটলো হয়তো। মুহূর্তেই চোখে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল। উপায় না পেয়ে হাতের বামদিকের গলি ধরে সেগুন বাঁগিচার দিকে ছুটতে লাগলাম। কতক্ষণ ছুটলাম জানি না। সামনে আমার কৈশোরের সেগুন বাঁগিচা (বহুমুখী) উচ্চ বিদ্যালয় লেখাটা আমাকে যেন সাহস জোগায়।

এদিকে আমার দু’চোখ বেয়ে অবিরল পানি ঝরছে। রুমালটা ভেজানো দরকার। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে রুমালটা ভিজিয়ে নিয়ে দু’চোখে চেপে ধরলাম। কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলো। কিন্তু রুমাল সরালেই সমানে চোখ জ্বলছে! একটা আট-দশ বছরের ছেলে বললো, ‘ওই যে দ্যাহেন আগুন ধরাইছে। ওইহানে যান! চোখ পোড়াইবো না!’

আমি তাই করলাম। কিন্তু আমার কোনো উপকার হলো না। কাগজ পোড়া ধোঁয়ায় চোখের জ্বালা বেড়ে গেল।

এখন এ এলাকার বাতাস পুরোটাই টিয়ার গ্যাসে ভর্তি। কোথাও সুবিধা হবে না। একটা দোকানের টুলে বসে চোখ বুঁজে থাকলাম কিছুক্ষণ। কিছুটা সময় পেরোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ মুহূর্তে এখান থেকে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বলা যায় না কোনদিক দিয়ে কোন বিপদ এসে হাজির হবে।

হঠাৎ স্কুলের বারান্দায় চোখ পড়তেই ননী স্যারকে দেখা গেল। চিনতে একটুও ভুল হলো না। স্যারের মাঝে দুটো পরিবর্তন দেখতে পেলাম। উনিশ-শ -আটাত্তরে যখন এ স্কুলে সিক্সে পড়তাম, তখন তাঁর দু'হাতের কিছু আর ঠোঁটের কিছু অংশে সামান্য শ্বেতি ছিলো। এখন ওটা পুরো শরীরে ছড়িয়ে গেছে। সে সময় এই ননী স্যার আর মৌলভী স্যারকে ভয় পেতাম বেশি। তবে ননী স্যারকে যেমন ভয় পেতাম ভালোও বাসতাম মনে হয় তেমনি। শুধু আমি কেন? হয়তো পুরো স্কুলের ছাত্ররাও একই রকম ভয় মিশ্রিত ভালোবাসায় আচ্ছন্ন ছিলো তখন। বোধকরি এখনও। ইচ্ছে হচ্ছিলো একবার গিয়ে পদধূলি নিয়ে আসি। কিন্তু এতগুলো বছর পর তিনি কি আমাকে চিনতে পারবেন? মোটে তো একবছর ক্লাস করেছি। সেভেনে উঠেই চলে গেছি গ্রামের বাড়ি। যিনি শত শত ছাত্র পড়িয়েছেন, তাঁর পক্ষে মাত্র একবছর ক্লাস করা একজন ব্যাক-বেঞ্চার ছাত্রের চেহারা মনে রাখবার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

আসলে মানুষের জীবনে একজন ভালো শিক্ষকের খুবই প্রয়োজন। আমার মতে শুধু প্রয়োজন বললে কম বলা হবে। জীবনে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। কিন্তু একজন ভালো শিক্ষকের প্রভাব না থাকলে তার জীবনটাকে সে পরিপূর্ণ করতে পারে না।

প্রায় আধঘন্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতেই আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম রাস্তার দিকে। যতই এগোচ্ছি ততই বুঝতে পারছিলাম লোকজনের ভয় এখনো কাটেনি। আমার ভয় ছিলো আবার মিছিল আসে কি না। মিছিল হলেই আবার পুলিশ। আবার টিয়ার গ্যাস। আবার হুটোপুটি। পড়িমরি দৌঁড়। প্রাণের নিরাপত্তাহীনতা! মৃত্যু ভয়!

প্রাণের ভয় কার নেই? আমিও জীবন ভালোবাসি। তাই ধীরেধীরে হেঁটে পল্টনের মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা বাস এসে থামতেই কোত্থেকে যেন পিঁপড়ের দঙ্গালের মত লোকজন এসে বাসের গেটটাকে আড়াল

করে ফেললো। আমার পক্ষে এত ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠা অসম্ভব!। আবার হেঁটে হেঁটে চললাম মতিঝিলের দিকে।

কোনো কাজ না থাকলে একাএকা হাঁটতে কখনোই খারাপ লাগে না আমার। যখন গ্রামে ছিলাম, তখন গ্রামের পথ ধরে হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম আরেক গ্রামে। কখনো কোনো গাছের ছাঁয়ায় বসে থাকতাম দীর্ঘক্ষণ। কারো সঙ্গে কথা বলতাম না বলে, লোকজন আমাকে নিয়ে নানা রকম অদ্ভুত কথা-বার্তা বলতো।

একবার একটা ঘটনা ঘটেছিলো। সেবার আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। ঘরে কি একটা ব্যাপার নিয়ে বাবার সঙ্গে রাগ করে এক বোতল ফেনারগ্যন ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলাম। আমার তেমন কিছুই হয়নি। তবে প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছিলো। মনে মনে এতেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এখন যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে মরে গেলে কিছুই বুঝতে পারবো না। তাই যাতে কিছুতেই ঘুম আসতে না পারে সে জন্য হাঁটা শুরু করলাম রাস্তা ধরে। খালি গায়ে ছিলাম। পা ও খালি। পরনে একটা পুরোনো লুঙ্গি। কেউ যাতে কিছু বুঝতে না পারে তেমন ভাবে গ্রাম থেকে বের হবার পথ ধরে হেঁটে চললাম। আমাদের গ্রামটা ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়কের পাশেই। সে সড়কে উঠে পশ্চিম দিকে হাঁটতে থাকলাম। কারো সঙ্গে কথা বললাম না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিলাম না। পরিচিত লোকজন বন্ধু-বান্ধবকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চললাম। কাউকে এড়াতে না পারলে সরাসরি না চেনার ভান করলাম। তখন ইলিয়টগঞ্জ বাজার পেরিয়ে গেছি। টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হতেই আমার বেশ ভালো লাগছিলো। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করলো। এতে অবশ্য একটা সুবিধা হলো এই যে, বৃষ্টির তোড়ে আমার ঘুম-ঘুম ভাবটা পুরোপুরিই কেটে গেছে। মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠলো মুহূর্তেই। ভেজা আর সোঁদা গন্ধ-মাখা পরিবেশটাকে উপভোগ করতে শুরু করলাম।

এভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় নিজকে আবিষ্কার করলাম রায়পুর কে.সি উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে। ঠান্ডায় শরীর কাঁপছিলো। দাঁতে দাঁত বাড়ি লেগে ঠক্-ঠক শব্দ হচ্ছিলো। ঠান্ডা বাতাস থেকে রক্ষা পেতে স্কুলের বারান্দায় উঠে গিয়ে দেয়ালের পাশে নিজকে আড়াল করি।

ইতোমধ্যে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েরা যে যার পথে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। আমি তাদের চলে যাওয়া দেখি এক মনে। আমার মত বৃষ্টিস্নাত আরো কিছু লোকজন উঠে এসেছিলো স্কুল-বারান্দায়। ওদের মধ্যে

কোত্থেকে যেন দু'জন জেলেও জুটেছিলো। জেলেদের একজন জিজ্ঞেস করলো, 'আমনের বাড়ি কোইও?'

কোনো জবাব দিলাম না।

আরেকজন বললো, 'মনে অয় মালু। গলার মাইদে কায়তন বান্ধা দ্যাহস না!'

'আরে না!'

পাশের জন বললো।

তারপর পূর্বোক্ত জন বললো, 'মনে অয় কোনো দাগা খাইছে! যেইডার দুঃখে মাথা আউলাইয়া গেছেগা!'

ওদের কথা-বার্তা শুনে আমার খুব হাসি পাচ্ছিলো। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে হাসি চেপে রাখলাম। হেসে ফেললে আমাকে ভন্ড বলে রামধোলাইও দিতে পারে! মনে তাই বেশ কিছুটা ভয় কাজ করছিলো। বৃষ্টি থেমে যেতেই সাততাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে এসেছিলাম।

বাড়ি ফেরার পথে গ্রামের আরো ক'জনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কারো কথার জবাব দিলাম না ইচ্ছে করেই। বাড়ি এসে শুনি আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি। মা খুব সতর্ক চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'তুই কি মরনের বুদ্ধি করছিলি?'

আমি হেসে বলি, 'জ্বরের ওষুধ খাইয়া কেউ মরতে শুনছো?'

আমার পেছনে একটা মটর সাইকেল পিপ পিপ করে হর্ণ বাজালো কয়েকবার। আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে লাফিয়ে ফুটপাতে উঠে গেলাম। মটর সাইকেল আরোহী কটমট করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে স্পীড তুলে চলে গেল।

মতিঝিলে তেমন ভিড় নেই।

একটু অপেক্ষার পরই প্রায় খালি একটা বাস পেয়ে গেলাম।

বাসে উঠে সিটে বসতেই বেশ আরাম অনুভূত হলো। এতক্ষণ হেঁটেছি বলে এখন বসতে পেরে খুব আরাম পাচ্ছিলাম। মনটা আবার ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো কত মাস ধরে আমার বউ-ছেলেকে দেখি না!

ঘরে ঢুকতেই ছেলে আমার খুশিতে লাফিয়ে উঠলো। চিৎকার করে জানান দিলো, 'মা-মা, দ্যাখো বাবা আচ্ছে!'

কিন্তু ব্যাপারটা যেন ছেলের মাকে মোটেও স্পর্শ করলো না। রায়না আমাকে শুনিয়ে ছেলেকে বললো, 'তোর বাবা আসছে তো আমি কি করবো এখন? নাচবো?'

বুঝলাম গতিক সুবিধের নয়। হয়তো বুঝতে পেরেছে সময়গুলো আমার ভালো কেটেছে। আর মেয়েরা এম্নিতেই যেন কেমন। অস্বাভাবিক ব্যাপারটা কেমন চট করে যেন টের পেয়ে যায়। রায়নাও কেমন করে যেন ঠিক ব্যাপারটা অনুমান করে ফেলতে পারে। তবে এগজাক্ট ব্যাপারটা না হলেও ধরনটা ঠিক কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ নিয়ে অবশ্য তেমন চিন্তা করি না।

কারণ সে তো বলেছেই যে, তার বরাদ্দ সময়টুকু ছাড়া অন্য সময়গুলো নিয়ে তার মাথাব্যাথা নেই। তাই গায়ে কিছুটা হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পারি। এ জন্য অবশ্য কিছুটা মিথ্যের আশ্রয়ও নিতে হয় আমাকে।

ছেলেকে কোলে নিতেই বুকের ভেতরকার অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেল। মনের স্ফূর্তি ভাবটা ফিরে এলো আবার। ছেলেকে বললাম, 'বাবা! আমি যে ছিলাম না, কেমন ছিলে?'

ছেলে বললো, 'ভালো না! সারাদিন আমার মন খারাপ ছিলো!'

'কেন বাবা?'

আমি জানতে চাই।

'তুমি যে রাত্রে বাসায় ছিলা না, তাই!'

বললাম, 'তাই তো! কাজটা একদম ভালো হয়নি! এখন কি করা যায় বলো তো?'

'আমার জন্য কিছু এনেছো?'

'না বাবা। কিছুই যে আনলাম না! জানো, রাস্তায় না আজ অনেক বোমা ফুটেছে। ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এসেছি!'

'তাই আমার জন্য কিছু আনতে ভুলে গেছ?'

'ঠিক বলেছো বাবা! আসলে আমি ভুলেই গেছি!'

'আরেকদিন অপিস থেকে আসার সময় আমার জন্য কিছু আনবা!'

বললাম, 'কি আনা যায় বলো তো?'

'মিমি লাবার!'

বুঝলাম তার চুইংগাম চাই। ছেলেটা চুইংগামকে বলে মিমি লাবার। তার সাথে সাথে আমরাও চুইংগামকে মিমি লাবার বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

জুতো পড়েই ঘরে ঢুকেছিলাম খুলবার সুযোগ তো পেলাম না। ছেলে কোলে উঠে আমাকে দখল করে রেখেছে। রায়না বললো, জুতোগুলো খুলবার দরকার নেই নাকি? ঘর নষ্ট হচ্ছে না? কয়টা কাজের মেয়ে রেখে দিয়েছো শুনি? যখন-তখন রাস্তার আবর্জনা নিয়ে ঘরে ঢুকবে! কে পরিষ্কার করে? শরীরটা কি আমার না অন্য কারো?'

বললাম, 'সুযোগ পেলাম কোথায়?'

'ছেলেটাকে নামাও! সোহাগ করবার জন্য সারাটা দিনই পড়ে আছে!'

আমার মনে হঠাৎ খটকা লাগলো। আমি বাইরে থেকে এলে তো ও কখনো এত বেশি মেজাজ দেখায় না! আজ হলো কি? নাকি সকাল থেকেই কোনো কারণে মেজাজ খাট্টা হয়ে আছে? ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'বাবা তোমার আম্মুর মাথা ঢিলা হয়ে গেছে! এখন নেমে পড়ো!'

ছেলেও দেখি সেয়ানা কম না। আমার ভঙ্গিতেই বললো, 'সকালে নানু এসেছিলো! আম্মু কান্না করেছে! আমাকে বকাও দিয়েছিলো!'

জুতোর ফিতা খুলতে খুলতে জানতে চাইলাম, 'কেন বকা দিলো? তুমি দুষ্টুমি করেছিলে?'

'না। কথা শুনিনাই যে, তাই!'

'কেন কথা শুনলে না?'

'নানুর কাছে যেতে দেয়নি!'

'আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করবো। তুমি এখন খেলো গিয়ে!'

ছেলেটা পে-নের ভঙ্গি করে কু-উ শব্দ করতে করতে আমার কাছ থেকে চলে গেল।

শাশুড়ি এসেছিলো শুনে মেজাজ আমার সত্যিই খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি। এদের পুরো খান্দানটাই উম্মাদ! কি করে না না করে তার ঠিক নেই। খুব সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে মায়ে ছায়ে তুমল ঝগড়া শুরু করে দেয়। অবশ্য আমার সামনে তেমন পারে না। কোনো অর্থহীন ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে দু'কথা বলেই তাদের উৎসাহ নষ্ট করে দেই। কাজেই আমার সাথে সুবিধে হয় না দেখে এখন আর কোনো ব্যাপারেই পারতঃপক্ষে কথা বলতে চায় না। এদিক দিয়ে কিছুটা স্বস্তিতে আছি। আজকের ব্যাপারটা কি ঘটেছে তা রায়নাই বলবে আমার কাছে। জিজ্ঞেস করতে হবে না

কিছুই। মুডটা ভালো হলেই হরবর করে সব বলে দেবে। আর আমিও সে অপেক্ষাতেই থাকি কখন সে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

দুপুরে খাওয়ার সময় পাশে বসে বউ বললো, 'নিজের গোষ্ঠির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখা যাবে না!'

আমি বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে বললাম, 'এমন কি কারণ ঘটলো?'

'আর বোলো না! ভাইয়া নাকি আম্মাকে বোতল ভাঙা নিয়ে মারতে গেছে!'

বললাম, 'কেন গেল? আর কেউ ছিলো না?'

'ছিলো দেখেই তো কোনো বিপদ হয়নি!'

বললাম, 'খোঁজ নিয়ে দ্যাখো গিয়ে, মিছেমিছি ভয় দেখিয়েছে কি না!'

আমার কথায় সায় দিয়ে রায়না বলে, 'আমি তো তাই ভাবছি!'

'তোমার ভাইয়ের নিশ্চয়ই টাকা-পয়সার দরকার। বউয়ের খোঁচায় হাফ-পাগলা হয়েই এমন নাটক করেছে। তবে বাপ-মার সাথে এমন করাটা ঠিক না। সে নিজেও বাপ হয়েছে। একদিন নিজের ছেলে-মেয়ের অত্যাচারে নিজেই বলবে কী এমন পাপ করেছিলাম যে, এমন ঘটলো? জেনে বুঝে তো জীবনে কোনো পাপ করিনি!'

'তুমি আছো তোমার থিয়োরি নিয়ে! ওরা কি এসব নিয়ে ভাবে কখনো?'

'ভাবে না বলেই তো আজ এসব ঘটছে! বাপ-মা নিজের ছেলে-মেয়ে ঠিক রাখতে পারে না। ছোটো বেলা থেকেই যদি আচ্ছা মত টাইট দিতো, তাহলে আর আজ এমন হতো না!'

বউ বললো, 'বেশি টাইট দিতে গিয়েই ভাইটাকে নষ্ট করে ফেলেছে!'

আমার কৌতূহল জেগে ওঠে। বলি, 'কেমন টাইট দিয়েছিলো শুনি?'

'আব্বা ছোটো বেলা খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে পেটাতো। শুধু কি তাই? কুমিরা বোস্টাল ইস্কুলে দিয়েও মানুষ বানাতে পারেনি!'

তারপরই ও কেমন যেন মনমরা হয়ে যায়। আমিও তাকে আর উৎসাহ যোগাই না। একসময় সে নিজেই আবার বলতে থাকে, 'আমার ভাইটাকে আসলে আমার বাপ-মা দু'জনে মিলেই নষ্ট করেছে! কাজের সময় কিছু বলে না আর অসময়ে ছোটাছুটি করে এর ওর কাছে!'

বললাম, 'তোমাদের এই পাগলের বংশ নিয়ে হয়েছে আমার যত ঝামেলা! না পারি বলতে, না পারি সহ্য করতে! কেন? তোমার ভাইকে কতবার করে

বললাম, একটা কিছু করুক! সাহেবের আবার চাকর-বাকর হতে ভালো লাগে না। বলে, চাকরি আমার পোষাবে না। বেতন পেলে বড় জোর হাজার পাঁচেক পাবো, তা দিয়ে আমার সংসার চলবে না!

তারপর আবার বললাম, 'এভাবে বাপ-মার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে কতদিন খাবে? সারাটা জীবন তো আর এম্নি করে চলতে পারে না। তোমাদের কতবার বলেছি যে, এমন অলস লোককে পাত্তা না দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বলো। তাহলেই কাজ-কাম শুরু করবে। জীবনটাকে চিনতে শিখবে। তোমাদের আদরে আদরে তো লোকটা শেষ হয়ে গেল!'

'মা-বাবা দু'জনেরই দোষ আছে! বাবা যদি না করে দেয় তো মা চুপ করে টাকা দিয়ে দেয়। আর মা না করলে বাবা। এই হচ্ছে মেইন প্রবলেম!'

বললাম, 'বাদ দাও ওসব! নিজের ভেজাল আগে সামলাও!'

'আমার কোনো ভেজাল নেই!'

'তাহলে তো বাঁচলাম!'

বউ আমার বুঝি বিরক্ত হয়ে গেল। বললো, 'এত পটর পটর না করে খাও তো!'

আমি আর কোনো কথা না বলে খাওয়া শেষ করতে মনোযোগী হই।

খাওয়ার পর শুলেই আমার ঘুম পেয়ে যায়। কিন্তু বিকেল বেলা ঘুম থেকে জাগলে শরীরে ব্যথা হয় খুব! মনে হয় ভেতরের দিকে সব মাংস পচে গেছে। সে ভয়ে দুপুরে ঘুমুতে ইচ্ছে হয় না। ভাবলাম একটু রেস্ট নিয়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে কোথাও ঘুরে আসবো। কোথায় যাওয়া যায় তা নিয়ে ভাবছিলাম। কিন্তু ভাবনার মাঝখান দিয়েই কলিংবেল বেজে উঠলো। মনের বিরক্তি চেপে উঠে গেলাম। দরজা খুলেই আমার অবাক হবার পালা। মূর্তিমান বিভিষীকা খোদ শ্বাশুড়িই দাঁড়িয়ে আছেন।

এখন তো সৌজন্য দেখাতেই হয়। না হলে অন্য জন গাল ফুলিয়ে রাখবে। রাতে ঘুমুবার আগে চোখ থেকে কমপক্ষে এক গ-াস পানি ফেলে বালিশটাকে ভিজিয়ে ফেলবে।

বললাম,'আসসালামো আলাইকুম! ভালো আছেন তো?'

তিনি আমার সালামের বা কুশল বার্তার তোয়াক্কা না করে জানতে চাইলেন, 'রায়না বাসায় নাই?'

বললাম, 'আসেন! রায়না আছে।'

আমাকে পাশ কাটিয়ে তিনি হনহন করে ঘরে ঢুকে গেলেন।

আমি আর কি করি! দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু ভেতরের ঘরে না ঢুকে ড্রয়িং রুমেই একটা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে বসলাম। কিন্তু আমার বেশিক্ষণ মনোযোগ রইলো না। মনে হচ্ছিলো, শ্বাশুড়ি এসেছেন কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে। আসলে সেসব কথা অর্থহীন। লোক জানাজানি করে মজা পান। হয়তো এখন বলবেন এমন কুলাঙ্গার ছেলেকে বাড়িতে জায়গা দেবেন না। বা সম্পত্তির কোনো ভাগই দেবেন না। কিন্তু ক'দিন পর দেখা যাবে যে, ছেলেকে নতুন কোনো কাজে উৎসাহ যোগাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে এসেছেন। সেগুলো যখন আবার ফুরিয়ে যাবে তখনই আবার মায়ে ছেলেতে বাক-যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। আমি যতবারই রায়নাকে বলেছি যে, যারা মুখের কথা ঠিক রাখতে পারে না, তাদের দু'চোখে দেখতে পারি না! ততবারই কোনো না কোনো বাহানা করে আমাকে তাদের পারিবারিক কোন্দলে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে।

শাশুড়ি বেশিক্ষণ থাকলেন না। একটু পরেই বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে আমাকে বললেন, 'দ্যাখেন মিয়া, আপনার সম্বন্ধি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করে এসেছে তা কোনো সন্তান তার মায়ের সাথে করে না!' বলে, তিনি আঁচলে একবার চোখ মোছেন।

তারপর আবার বললেন, 'আগামী শুক্রবারে আপনারা সবাই যাবেন! আমার এ বিচারটা করে দিয়ে আসবেন! আমি আর তার ব্যাপারে কিছুই জানি না! ও যেন আমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক না রাখে!'

মনে মনে বললাম, পাগলের প্রলাপ!

তারপর মুখে বললাম, 'আপনারা তো প্রায়ই এমন করেন। আবার কিছুদিন বাদে সব ঠিক হয়ে যায়!'

'এবার আর তেমন কিছু না। আমি যদি আমার বাপের জন্ম হয়ে থাকি তো, আমিও আর ওদের বাপ-ব্যটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবো না!'

ভদ্রমহিলা মানে আমার শাশুড়ির মাঝে নারী সুলভ কোনো আচরণ তো দুরের কথা, কোনো সুস্থ মানুষের আচরণ আমি খুঁজে পাইনি। মনে মনে একবার শুয়োরের বাচ্চা বলে গাল দিয়ে বললাম, 'এর আগেও আপনাদের মায়ে ছেলের সমস্যার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে দোষী হয়েছি। এবার আর আমি কোনো কথা শুনতে রাজী না! আপনি যে আবার আমাকে ভেজালে ফেলবেন না তার কি নিশ্চয়তা আছে? তারচে বরং আপনি একটা স্ট্যাম্পে এসব কথা লিখে সই করে দিয়ে যান, পরে আমি গিয়ে এ ব্যাপারে কথা বলবো!'

আমার কথায় জোঁকের মুখে নুন পড়লো যেন। কোনো কথা না বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

রায়না বললো, 'কি কথা হলো তোমাদের?'

বললাম, 'তোমার মায়ের বাপ মনে হয় একজন না! যে কারণে মুখের কথাও ঠিক থাকে না। এই যে কিছুদিন আগে আমাকে আর তোমার মামুকে পল্টুর শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়েছিলো মনে আছে? তখন তোমার মা আমাকে বার বার বলে দিয়েছে যে, পল্টুর বাচ্চা দু'টোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। ওই হস্তিনী নারী মানে পল্টুর বউ মাসুমাকে যেন কিছুই না বলি। এটা কি সম্ভব? অথচ তোমার মা তোমার ভাইকে বলেছিলো যে, আমাদের পাঠিয়েছে তার বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবার জন্য।'

রায়নার বুকে যেন কাঁটা হয়ে বেঁধে কথাগুলো। মুখটা তার নিমেষেই কালো হয়ে যায়।

এ কেমন চরিত্রের মানুষ? মানুষ হলেও তার ভেতরে কি মানুষের আত্মা আছে? নাকি কেবল খোলসটাই মানুষের? অথচ বুক ফুলিয়ে মানুষের কাছে বলে বীরপ্রতীক শহীদ সামসুজ্জামানের বোন। যদি তাই হবে, শহীদ জননী আয়াতুন্নেছার লাশ কেন বেওয়ারিশের মতন পথে পড়ে ছিলো? এই কি আমাদের দেশের শহীদ জননীর সম্মান? আর বীরপ্রতীক শহীদের বোনের কার্যকলাপে লোকে ছি ছি করে?

কিন্তু কথাগুলো মনের ভেতরেই আলোড়িত হয়। শব্দ হয়ে আর উচ্চারিত হয় না। কারণ আমার স্ত্রী তারই গর্ভজাত। সবগুলো গুণের কিছু না কিছু পেয়েছে। তবে স্কুল-কলেজে আসা-যাওয়া করেছে বলে এক-আধটু বিদ্যে তো পেটে পড়েছে। কাজেই অন্তর্গত স্বভাবগুলোও আগ্নেয়গিরির মত গলিত লাভাগুলোকে বুকের গহীনে চাপা দিয়ে রাখতে শিখেছে। তাই খানিকটা নাড়া খেলেই সেগুলো বেরিয়ে আসতে চায় বিপুল বেগে। সচেতন মানবী খুব দ্রুতই নিজকে সামলে নিতে পারে। কিন্তু এ ভাবে কতদিন ঘুমিয়ে থাকবে আগ্নেয়গিরি?

আমার ধারণা এরা প্রতিটি বোনই বুকের ভেতর চাপা দিয়ে রেখেছে তরল আগুন। যে কোনো সময়ই তা বেরিয়ে এসে সংসার তছনছ করে দেবে।

এর বড় বোনটার স্বামী আমার শ্বশুর সাহেবের মত ভেড়া বলেই রক্ষে! ঝগড়া লাগলে তো শুয়োরের বাচ্চা ছাড়া কোনো কথাই নেই। হয়তো কালে কালে আমিও একদিন ভেড়া বনে যাবো। তবে আমার ভেতরকার অসুরটা যদ্দিন সজাগ আছে, সে কখনো মরে না গেলে সাময়িক অগ্ন্যুৎপাত ঠিকই

পায়ে চেপে বন্ধ করে রাখবো। আমার ভেতরকার অসুর নিধনে আমি কখনোই উৎসাহী হব না। বোধকরি কোনো পুরুষেরই উচিত হবে না। কারণ স্ত্রী হিসেবে যদ্দিন তাদের গায়ে তাকদ আছে, ততদিন থাকে মিচকি শয়তানের মতই। বাইরে থেকে কিছুই টের পাওয়া যায় না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারও পরে রাত চলে এলো। এখন টিভিতে আটটার সংবাদ হচ্ছে। অথচ আমার চায়ের তেষ্টা পেয়েছে খুব। কিন্তু এককাপ চা পেলাম না। রায়না ছেলে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। দু'বার বলেছি চায়ের কথা। বলেছে খারাপ লাগছে। পরে বানিয়ে দেবে। আসলে এসব কিছু না। শাশুড়িকে যে সবক দিয়েছি, তাতে তার আঁতে লেগেছে। তারই অহিংস আর নিরব প্রতিবাদ হিসেবে আমার চা পাওয়াটা বিলম্বিত হচ্ছে। হয়তো দেখা যাবে খারাপ লাগার অজুহাতে রাতের ভাতটাও খেলো না।

চায়ের আশায় থেকে লাভ নেই। রাতের খবারটা খেয়ে আজ একটু আগে আগেই ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছিলাম। বউকে আলতো ঠেলা দিয়ে বললাম, 'এই ভাত খাবে না?'

'আমার ভাল-াগছে না!'

তার মানে সে শোয়া থেকে উঠবে না। কাজেই নিজে নিজেই হাঁড়ি থেকে ভাত-তরকারি নিয়ে খেতে বসি। আমার খাওয়ার শেষ পর্যায়ে সে উঠে এসে বললো, 'আর সহ্য হলো না? পেটে কি রাক্ষস ঢুকেছে?'

আমার রাগ চড়ে গেলেও শান্ত স্বরে বললাম, 'রাক্ষস না ঢুকলে কি আর বউ থাকতেও নিজে ভাত বেড়ে খাই?'

রায়না সঙ্গে সঙ্গেই ফোঁস করে ওঠে। 'কী পাষন্ড রে! আমি মরতে নিলেও দেখা যাবে তোমার কাজটাই আগে! তোমারটাই সব সময় ষোলোআনা!'

এখন আমি মুখ খুললেই ফাটাফাটি! আসলে পোষা বাঁদর, গরু আর বউ মাঝে মাঝে শায়েস্তা করতে হয়। নইলে এরা মাথায় চড়ে বসে। বোঝা যাচ্ছে আরেক দফা গ-াস-থালা ভাঙবার সময় চলে এসেছে। এমন ভাঙাভাঙি করলে রায়না কিছুদিন শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকে। মাঝখানে দীর্ঘ বিরতি পড়লেই সে আবার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হতে চায়। আমি এতদিনে বুঝে গেছি যে, ব্যাপারটা সে তার মাতৃকূল থেকেই রক্তে বহন করছে। যেটা সে এতকাল ধরে তার শিরা-উপশিরায় বয়ে বেড়াচ্ছে তা কী করে হঠাৎ বিস্মৃত হবে? মাঝে মাঝে আমার মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছে জাগে। সেটা হলো, কোনো ক্লিনিকে নিয়ে

গিয়ে তার শরীরের সব রক্ত পাল্টে আনি। এতে যদি স্বভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়।

আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ অনেক বদলে গেছি। এক সময় কোনো বিবাহ যোগ্য যুবকের জন্য পাত্রী দেখতে গেলে বা বিয়ের কথা-বার্তা চলতে থাকলে দু'পক্ষেরই চৌদ্দ-পুরুষের খোঁজ-খবর করতো বলে মুরুব্বিদের উপহাস করতাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি বিয়ের জন্য কেন এত খোঁজ-খবর করা লাগে!

বলতে গেলে আমি এক বসাতেই বিয়ে করেছিলাম। কোনো খোঁজ-খবরের প্রয়োজন মনে করিনি। আমার ছয় বছরের বিবাহিত জীবনে একটু একটু করে জেনেছি। আসলে ওরাই বলেছে যে, আমার শাশুড়ি এক সময় মানসিক রোগী ছিলেন। শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতো। নানি শাশুরিকে জ্বিন-পেত্নিরা ভর করে থাকতো। নানা শ্বশুরও হাফ-পাগল ছিলেন। উত্তরাধীকার সূত্রে আমার স্ত্রী, তার ভাই-বোন মানসিক বিকারগ্রস্ত হবে না এটাই বরং আশ্চর্যের ব্যাপার! আসলে মুরুব্বিদের ক্রিয়া-কলাপ সবই অভিজ্ঞতার সফল প্রকাশ। কোনো শাস্ত্র বা গ্রন্থভুক্ত নয়।

ঘুমোনোর সময় দেখা গেল আমাদের মাঝখানে ছেলের ঘুমের ব্যবস্থা হয়েছে। দু'পাশে পিতা-মাতা, মাঝখানে সন্তান। তার মানে আমার সাথে তার আঁড়ি!

ভেতরে ভেতরে আমার রাগ কমেনি এতটুকুও। শুয়ে আর ঘুম আসছিলো না। ঘুম না এলে শুয়ে থাকা যে কি কষ্টকর ব্যাপার, তা কেবল ভুক্তভোগীই জানে! উঠে গিয়ে অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। রাত অনেক হয়েছে বোঝা যায়। ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে তাকাই ঘড়ির দিকে। ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘরেই স্থির হয়ে আছে। বাইরে লোকজন নেই। রিকশাও নেই। দুরের মেইন রোড দিয়ে মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি চলাচলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

আমার বেশিক্ষণ বসা হয় না। মশার উৎপাত খুব বেশি। সস্তা এলাকার যা হয় আর কি! ডোবা-নালা, খানা-খন্দের অভাব নেই। এমন অনুকূল পরিবেশে মশা দম্পতিদের অবিরাম বংশ বিস্তারেও কোনো বাধা নেই। উঠবো উঠবো ভাবছি এমন সময় পাশের বাড়ির বারান্দায় ফিসফাস। কাঁচের চুড়ির হালকা রিনিঝিনি। আমার চক্ষু চড়কগাছ! বাড়িওয়ালা আর তাদের কাজের মেয়েটা না? মনে হলো ধন্ধ দেখছি। একবার কাশির শব্দ করতেই সুরুৎ করে হাজি

সাহেব ঘরে ঢুকে গেলেন। মেয়েটা বারান্দাতেই ঘুমায়। অনেক দিন তাকে এলামেলো প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় দেখেছি। এখন তো দেখছি মধুকুঞ্জ!

ভোরবেলা দরজায় দুপদাপ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

এমনিতেই বেশি রাত করে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমটা নষ্ট হলো বলে মেজাজটা আমার খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে দরজার ওপাশের মানুষটার চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে করতে দরজা খুলেই দেখি শাশুড়ি দাঁড়িয়ে আছেন। মনেমনে আবার শুয়োরের বাচ্চা বলি। বাসি মুখেই এমন অশুভ চেহারা দেখলাম! আজ নির্ঘাৎ আমার কপালে খারাবি আছে!

হঠাৎ ঘুম ভাঙবার ফলে আমার সারা শরীর কাঁপছিলো। এখন একটু শুতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু আমি এখন শুয়ে পড়লে এই কথিত মুরুব্বির অপমান হবে। রায়নাকে ঠেলে তুলে দিয়ে বিছানায় বসে থাকলাম।

তিনি বললেন, 'আমি আপনার কাছে এসেছি। দুটো কথা বলেই আবার চলে যাবো!'

এই মহিলার গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা। যা খুবই বিশ্রি লাগে শুনতে। বললাম, 'আপনি না গতকাল চলে যাবার কথা ছিলো?'

'কথা ছিলো। কিন্তু আরো বলবার বাকি আছে। পুরো বিষয়টা না জানলে বলবেন কিভাবে?'

আমি চেষ্টা করি যাতে তার কথা দীর্ঘ না হয়। কারণ একটানা ছয়-ঘন্টা বক বক করে একবার আমার মাথা গরম করে দিয়েছিলেন। শেষে আমার মাথায় ঠান্ডা তেল দিতে হয়েছিলো। কথার ফাঁদে যাতে জড়িয়ে না যাই, তাই বললাম, 'আপনার মেয়ের কাছে বলেন। আমাকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে!'

শাশুড়ির বাচনিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নেই। বেশ নিরিবিলি। আমার মতে বাড়িওয়ালা বা আর্কিটেক্টদের উচিত বাড়ির ডিজাইন করার সময় টয়লেটের পরিসরটা আরো বাড়িয়ে দেয়া। সেই সঙ্গে সাউন্ডপ্রুফ করবার ব্যবস্থা করা।

পালিয়ে থাকতে গিয়ে অহেতুক কতগুলো সময় নষ্ট হয়ে গেল। ফলে, সকালের নাস্তাটা করার সময় পেলাম না। আমি টয়লেটে থাকতেই শাশুড়ি চলে গিয়েছিলেন বলে বেশ স্বস্তি অনুভব করছিলাম।

কাপড়-চোপড় পড়ে বের হতেই রাস্তাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি প্রচুর মানুষের ভিড়। ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারিনি।

পাশেই আমার মত একজন অপেক্ষমান যাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কি ভাই, গাড়ি-টাড়ি নেই নাকি?'

'লোকটা বললো, 'আরে ভাই বলবেন না! এখানে এসেই শুনতে পেলাম আজ হরতাল!'

'কারা হরতাল ডেকেছে?'

'তা বলতে পারছি না! কথা নাই বার্তা নাই, ঘুম থেকে উঠে স্বাভাবিক দিন শুরু করার মুহূর্তে জানতে পারি দিনটা খারাপ যাবে! আজ হরতাল তো কাল ধর্মঘট! পরশু দেখি অবরোধ নয় তো রাস্তা কাটা। গাড়ি যায় ভিন্ন রুটে! ঘুম ভেঙে জানতে পাই সরকার বদল হয়ে গেছে! কী আজিব দেশে বাস করি আমরা?'

ভদ্রলোকের কথায় যুক্তি আছে। কেন আমরা আজিব দেশের বাসিন্দা হবো? সেটাই এতকাল ধরেও আমরা কেউ উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। না কি উত্তর পেতে কেউ চেষ্টা করছি না? আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এখন অফিসে যাই কি ভাবে? তবে একটা ব্যাপারে একটু ভরসা আছে যে, যত বড় আর কঠিন হরতালই হোক না কেন, দু'একটা গাড়ি অবশ্যই চলবে। সব হরতালেই অল্পসল্প গাড়ি চলে। এখন কথা হচ্ছে গিয়ে যে গাড়িটা আসবে, তাতে উঠতে পারবো তো?

একবার মনে হলো ঘরে ফিরে যাই। কিন্তু আরেক মন বলে ঘরে বাইরে একই অবস্থা। আজ আমার কোথাও শান্তি নেই। শেষ পর্যন্ত একটা খালি মিনি বাসই এলো। কিন্তু মতিঝিলের ভাড়া চাচ্ছে দ্বিগুণ। দেখলাম লোকজন বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠে যাচ্ছে। মনে হয় বাসঅলা তিনটাকা ভাড়ার জায়গায় দশটাকা চাইলেও লোকজন এভাবেই উঠতো। কোনো প্রতিবাদ নেই। কোনো নীতিবোধ নেই। মানুষগুলো দিন দিন হচ্ছে কি?

অফিসে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গেল। অফিসে তেমন কোনো কাজ নেই। হরতালের জন্য লোকজন তেমন আসেনি। তবে খাঁন সাহেব আছেন ঠিকই। তাঁর সমস্ত মনোযোগ পত্রিকার পাতায়। আজ এমন ঢিলে-ঢালা ভাবেই অফিস চলবে। কিছুই করবার নেই।

সাড়ে চারটায় খাঁন সাহেব বেরিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'আপনারা চলে যান! থেকে আর কি হবে?'

আমারও বের হয়ে যাওয়াই উচিত ছিলো। কিন্তু আমার ভীতু মন বলছিলো যে, এখনই যাওয়াটা উচিত হবে না। এমন ভাবনার মাঝেই হঠাৎ চিফ এসে

হাজির হলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'ওহ মমিন তুমি আছো দেখছি! একবার আমার রুমে এসো!'

কিছুক্ষণ পর চিফের রুমে যেতেই তিনি এক টুকরো কাগজ বের করে আমার সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, 'এখানে এরিয়া আর লে-আউট দেয়া আছে। আজ যতক্ষণ লাগে, থেকে কাজটা করে দিয়ে যাও! আমি ততক্ষণ আছি!'

আমি কাজ বুঝে নিয়ে টেবিলে ফেরত এলাম। কাজটা প্রায় গুছিয়ে এনেছি এমন সময় শান্তা ডাকলো, 'মমিন ভাই, নিলয়'দা!'

আমি রিসিভার কানে লাগিয়ে বললাম, 'হারামখোর! বিরক্ত করবার আর সময় পাও না, না? অফিসে আসলি না ক্যান?'

নিলয় বললো, 'গুরু, আজকে তো হরতাল! গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ!'

'আমি এলাম কি করে?'

'গুরু, বসদের মত কথা কইবা না তো! আমি একটা ভেজালে আছি!'

'বুঝতে পারছি! কবে এলো?'

'গত রাত্রে!'

'এখন আমাকে কি করতে হবে?'

'চিফরে কোনো ভাবে ম্যানেজ করো! আগামীকাল আসতে পারবো না!'

'কোনো কাজ পেন্ডিং আছে?'

'না। আউটপুট সব চিফের কাছে আছে। কোনো কারেকশান থাকলে তুমি দেইখো!'

'ঠিক আছে!'

'থ্যাঙ্ক ইউ!' বলে, নিলয় ফোন রেখে দিলো।

আমি চিফের রুমে ঢুকতেই তিনি চশমার উপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবার কি? কাজটা দেইনি?'

' সে জন্য না বস!'

'তাহলে?'

'নিলয় ফোন করে বললো আগামীকাল আসতে পারছে না!'

'প্রবলেমটা কি?'

'পেটে না মাথায় কিছু একটা হয়েছে। ফোনের লাইনটা ডিস্টার্ব করছিলো বলে ঠিক বুঝতে পারলাম না!'

‘কি আর করা! ওর ছুটি নিতে ইচ্ছে হয়েছে। একটা বাহানা না করলে তো চলে না! যাও এখন! চাপটা তোমার উপর দিয়েই যাবে!’

যাক, বিপদটা কাটলো। কিন্তু আমার বিপদ সারাবে কে?

আজ যে কখন বেরুতে পারবো তার কোনো ঠিক নেই। তবুও যতক্ষণ হোক কাজটা শেষ করে বের হতে হবে। আগামীকাল নিশ্চয়ই ফাইনাল মিটিং আছে। এ সমস্ত লাইন টানার কাজ করতে আমার কখনোই ভালো লাগে না! কোনো সৃজনশীলতা নেই। অন্যের কাজ দেখে দেখে নকল করবার মাঝে কোনো আনন্দ আছে বলে মনে হয় না। এ নিয়ে মাঝে মাঝে নিলয়ের সঙ্গে আলাপ করলে সে বলতো, ‘গুরু! তোমার এইসব কাম ভালো না লাগলে সত্যজিৎ রায় হইতে পারলা না? নাইলে জয়নুল আবেদীন?’

তখন আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হয় যে, আমার মাঝে তেমন কিছুর আভাস থাকলেও না হয় চেষ্টা করে দেখতাম। দুধ ছাড়া দই কখনো হয়? নিলয় ইয়ার্কি করে বলে, ‘এঁটেল মাটি পানিতে গোলালে কাদার দই হবে!’

ভালো না লাগলেও মনের ওপর জোর খাটিয়ে কাজ করছিলাম। কাজটা শেষ করে এনেছি প্রায়। এমন সময় চীফকে দেখা গেল পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললাম, ‘আর মিনিট দশেক বস!’

‘গুড! তাহলে পার্টিকে বলে দেই আগামীকালই ফাইনাল মিটিং। কিছুক্ষণ আগে ফোনে জানতে চেয়েছিলো। দশটায় মিটিং ডাকি। কি বলো? এটাই ভালো হবে না?’

‘জি বস!’

তিনি আবার তার রুমে গিয়ে ঢুকলেন।

কাজ শেষ করে অফিস থেকে বেরোতেই রাত ন’টা বেজে গেল।

বাসায় ফিরতে ফিরতে কম করে হলেও এগারটা বাজবে। রাস্তায় নেমে খালি রিকশা পাবার অপেক্ষায় আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম যে, দেশের এখন যা অবস্থা। দিন-দুপুরেই হাইজ্যাকার এসে ধরে। বিনা দোষে মানুষকে ধরে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। মোটা অংকের টাকা চায়। অস্ত্র মামলায় জড়ানোর ভয় দেখায়। নইলে নির্যাতন করে। হঠাৎ ছিনতাই ছিনতাই বলে চিৎকার শোনা গেল।

শব্দের উৎস খুঁজতে মাথা ঘোরাই পেছনের দিকে। একটা রিকশা থেমে আছে। তাতে দু’জন যাত্রী। নারী-পুরুষ। স্বামী-স্ত্রী বলেই অনুমান করি। আর

তখনই আমার পাশ দিয়ে একজন অল্প বয়েসী ছেলে দৌড়েঝড়ে চলে গেল। সামনের রাস্তায় টহল পুলিশ দু’জন ছিলো। চিৎকার করে বললাম, ‘পালিয়ে যাচ্ছে! ধরেন!’ কিন্তু ওরা কি করবে তাই হয়তো স্থির করতে পারলো না। অথচ আমার বলার সাথে সাথেই সক্রিয় হলে ওরা ছেলেটাকে ধরতে পারতো। ওদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বললাম, ‘কি করলেন?’

একজন বললো, ‘আপনের কিছু নিছে? তাইলে বলেন। অন্যের ওকালতি কইরেন না!’

বললাম, ‘এটা কেমন কথা? একজন ছিনতাই করে পালিয়ে যাবে আপনাদের কিছু করবার নেই?’

‘আছে।’ অন্যজন বললো। ‘আপনেই তো দেখলেন, তারা চিল-াইলো। কিন্তু রিকশা ঘুরাইয়া চইলা গেল। আমাগ কাছে আইয়া অন্তত একবার কইতে পারতো কি ক্ষতিটা হইলো? আপনে আমি কইলে কিছু হইবো? নাকি যার ক্ষতি হইলো সে কিছু কইবো?’

বললাম, ‘কথা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে ধরতে পারতাম!’

‘আরে মিয়া ছাড়েন! যদি জিগাইতাম কি নিছে? তারাই হয়তো কইতো তেমন কিছু না! থাক, জিডি বা কেইস করার দরকার নাই! তখন আমাদের কিছু করার থাকে, বলেন?’

‘না। তা অবশ্য থাকে না!’

কিন্তু মনে মনে বললাম, মিয়ারা! তোমাদের মত লোকজনকে আজকাল কেউই বিশ্বাস করে না। কী নিশ্চয়তা আছে যে, এই কিছুক্ষণ আগের ছিনতাইয়ে তোমাদের হাত নাই? নইলে ওই ব্যাটা এভাবে পালাতে পারে?

একজন বললো, ‘যান ভাইজান, বাসায় যান গিয়া! নাইলে দেখা যাইবো আপনেও কখন ওই মিয়াগ পাল-ায় পইড়া গেছেন!’

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সামনের দিকে পা বাড়াই। বলা যায় না, এরাই কখন আমাকে ধরে হাইজ্যাকার বলে চালান দিয়ে দেবে। যে দেশে তিন-চার বছরের শিশুরা ফৌজদারী মামলার আসামী হয়। যে শিশুরা বাবার কোলে চড়ে কোর্টে হাজিরা দিতে যায়। পুলিশ হয়ে নিজেই ছিনতাই করে। সে দেশের পুলিশদের আর যাই হোক, বিশ্বাস করা যায় না মোটেও!

অফিসে তেমন কাজ ছিলো না। বলতে গেলে ফাঁকা অফিস। উপরের লেভেলের সবাই মিটিং-এ চলে গেছেন। নিলয় ক’দিন যাবত অফিসে আসছে

না বলে, আমি বলতে গেলে একাই আছি। ও থাকলে আমাদের মাঝে টুকটাক কথা-বার্তা হতো। কাজ নিয়ে আলোচনা হতো। মাঝে মাঝে আপন আপন পান্ডিত্য জাহির করা নিয়ে ছোট-খাট ঝগড়া হতো বলে সময়টা কখনোই একঘেয়ে মনে হতো না। তাই নিঃসঙ্গতা কাটাতে আমি লো-ভল্যুমে পুরোনো দিনের গান শুনছিলাম। শান্তা কি মনে করে উঠে এলো। আমি কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার?'

শান্তা বললো, 'কি ব্যাপার মানে?'

শান্তার পাল্টা জিজ্ঞাসায় আমি থতমত হয়ে বললাম, 'না। মানে, আপনি কখনো এদিকে আসেন না তো, তাই বলছিলাম আর কি!'

'কখনো আসিনি বলে যে আসা যাবে না, এমন তো না!'

'তা অবশ্য ঠিক! আমি এত কিছু ভেবে বলিনি!'

তবু আমার মনে হচ্ছে শান্তা এমনি এমনি আসেনি। এমনও হতে পারে কোনো কাজ নেই বলে একটু আলাপ করে সময় কাটাতে চাচ্ছে। কিংবা গান শুনবার ব্যাপারটা তাকে আমার সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলেছে। তা ছাড়া তার পরনে আজ নতুন প্রিন্টের সুন্দর একটা রাজশাহী সিল্ক। নতুন শাড়ী সম্পর্কে আমার মন্তব্য শুনবার ইচ্ছেতেও আসতে পারে। আমার ভাবনা যাই হোক। তবে সে নিছক গল্প করতে আসেনি। এ আমি নিশ্চিত!

শান্তাকে বললাম, 'বসেন! শাড়িটা সুন্দর! তবে আপনার জন্য রঙটা আরেকটু ডিপ হলে ভালো হতো!'

শান্তা একটা চেয়ার টেনে বসে বললো, 'ডিপ কালারটা পেলাম না!'

তারপর আঁচল টেনে কিছুটা টানটান হয়ে বললো, 'আপনি দেখছি সেই মান্ধাতা আমলের গান শুনছেন!'

বলালাম, 'আমি মানুষটাও তো মান্ধাতা আমলের!'

শান্তা বললো, 'আপনার বয়স কি খুব বেশি হয়ে গেছে বলে মনে করেন?'

'কমই বা বলি কিভাবে?'

'আপনার বয়স কত তাহলে?'

'চলি-শ হবে না!'

'কত হতে পারে?'

বললাম, আমার জন্ম তারিখ জানি না। স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় তালেব উল-হ স্যার তারিখটা ফরমে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী বলা যায়!'

শান্তা আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, 'আমিও আমার জন্ম তারিখ জানি না! তাই বলে আমার বয়সটা আমি অনুমান করতে পারবো না? সার্টিফিকেট এজের সঙ্গে আরো দু'এক বছর এ্যাড করে নিলেই মোটামুটি বয়সটা বলা যায়।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললাম, 'সার্টিফিকেট বলছে আমার জন্ম জানুয়ারির এক তারিখ। উনিশ-শ-আটষট্টি সাল। তার সঙ্গে যদি আপনার কথামত আরো দু'বছর যোগ করি, তাহলে আমার বর্তমান বয়স এই দু'হাজার এক সালে এসে দাঁড়াচ্ছে পঁয়ত্রিশ!'

শান্তা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো।

তারপর বললো, 'পঁয়ত্রিশ কী আর এমন বয়েস! আমারই তো চলছে তেত্রিশ। কিন্তু আপনাকে দেখে অতটা মনে হয় না।'

শান্তার বয়সের কথা শুনে অবধারিত ভাবেই আমার মাথায় এসে যায় যে, তার বিয়ে, অথবা বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে কি না। কিন্তু কথাটা সে কিভাবে নেবে ভাবতেই আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো না।

গানের ভলিউম কমিয়ে দিয়ে বললাম, 'তাহলে আমি বলি শুনেন! একাত্তর সালে আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। বেবি ক্লাসে। অবশ্য তখন কোন সাল কোন মাস এসবের ব্যাপারে ভাবনা ছিলো না। জানতামও না। পরে ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পেরেছি সময়টা একাত্তরই ছিলো। আপনি জানেন কিনা জানি না। বর্তমান রাজউক ভবনের পুরোনো নাম ছিলো ডিআইটি বিল্ডিং। তার সামনে বা পাশাপাশি ছিলো জাসদ অফিস। রাস্তাটা পেরিয়ে আরেকটু পশ্চিমে এলেই ছিলো ইপিআর কলোনি। তার পাশেই ইমতিয়াজ আকবর প্রাইমারি স্কুল। টিনের চাল দেয়া ওয়াল করা হলুদ রঙ করা স্কুল ঘর। এখন আমার যদ্দুর মনে পড়ে স্কুলের দেয়ালে সিমেন্ট দিয়ে তৈরী বড় বড় ইংরেজি অরে লেখা ছিলো স্কুলের নাম। রেড অক্সাইডের রঙে রাঙানো ছিলো সে অক্ষরগুলো। তখন আমার বয়স কত হতে পারে? একটা বাচ্চা নরমালি কত বছর বয়সে প্রথম স্কুলে যায়?'

শান্তা বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনছিলো আমার কথাগুলো। বললো, 'চার-পাঁচ বছর বয়সে!'

বললাম, 'তাহলে ধরেন, তখন আমার বয়স পাঁচ।'

শান্তা বললো, 'তখন যদি আপনার পাঁচ হয়, তাহলে এখন আপনার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ।'

কিছুক্ষণ পর শান্তা আবার বলে, 'সার্টিফিকেট অনুযায়ী দাঁড়ায় তেত্রিশ। তাহলে তো দেখছি আপনার জীবনের অর্ধেকটা সময় অলরেডি পার করে দিয়েছেন।

বললাম, 'পার করে দেইনি। বলতে পারেন সময়টা চলে গেছে। আমিই ধরে রাখতে পারিনি!'

এমন সময় হাঠাৎ ফোনটা বেজে উঠতেই শান্তা ছুটে গেল। ফোনে কারো সঙ্গে জি জি করে আবার ফিরে আসতে আসতে বললো, 'স্যার ফোন করেছিলেন। বললেন, আপনি পাঁচটার পর যেন থাকেন। স্যারের আসতে কিছুটা দেরি হবে!'

বললাম, 'এমনটা আমিও অনুমান করছিলাম।'

শান্তা আবার সামনের চেয়ারটাতে বসে বললো, 'তাহলে উনিশ'শ একাত্তরের কিছু মনে আছে আপনার?'

'তেমন বেশি কিছু দেখিনি। কাজেই মনে রাখবার কী বা থাকবে?'

'তাহলে আপনি কী করে বললেন যে, একাত্তরে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন?'

'বললাম না ইতিহাস অনুযায়ী!'

'যেমন?'

দৃষ্টিতে আগ্রহ নিয়ে টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে গালে হাত রেখে শান্তা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বললাম, 'ইতিহাস বলে যে, একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের দেশে গণহত্যা চালিয়েছে। স্কুলে ভর্তির কিছুদিন পরেই এ ঘটনা ঘটে!'

'তখন কোথায় থাকতেন?'

'আমাদের ঘর যেখানে ছিলো বর্তমান সচিবালয়ের সামনে। এখন সেখানে ওসমানী মিলনায়তন।'

'দু'একটা ঘটনার কথা বলেন না, শুনি!'

শান্তার কণ্ঠে অনুনয়। আমার বেশ ভালো লাগে। বলতে উৎসাহ পাই। বলি, 'তেমন বড় ঘটনা তো বলতে পারবো না। তবে টুকরো টুকরো ক'টা ঘটনার কথা বলতে পারি, যা শুনে আপনি একটার সঙ্গে আরেকটা ঘটনার জোড়া দিলে মোটামুটি একটা চিত্র পেয়ে যাবেন!'

'তাই বলেন!'

'সেখানে আমরা যে কোয়ার্টারে থাকতাম, সেখানে একটা আমগাছ ছিলো। বড়দের আলোচনা থেকে শুনেছিলাম এবং নিজেও দেখেছিলাম যে, পাকিস্তানী আর্মিরা মানুষ মেরেছে এর প্রতিবাদে শহরের বিভিন্ন জায়গায় কালো পতাকা টানানো হয়েছিলো। সে সূত্র ধরে বড় ভাইয়েরা মিলে, আমাদের সেই আমগাছটাতে একটা কালো পতাকা টানিয়ে দিয়েছিলো। কাপড়ের অভাবে পতাকাটা তৈরী করা হয়েছিলো পুরোনো ছাতার কাপড় দিয়ে। আমরা বাইরে বোরোতে পারতাম না। বড়রা বাধা দিয়ে বলতেন, বাইরে কার্ফ্যু! তখন ছিলো আমের মৌসুম। গাছে ছোট ছোট আম ছিলো। কালো পতাকা টানানোর দু'চারদিন পর বর্তমান সচিবালয়ের যেখানে আমাদের স্বাধীনতার পতাকাটা উড়ছে, সেখানে তখন টানানো হতো পাকিস্তানী পতাকা। এর আগে কিছু সাহসী বাঙালী পতাকাটা খুলে নিয়ে গিয়েছিলো। সেটা ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমিও দেখতে পেয়েছিলাম। পরে শুনেছি যে, পতাকাটা পুড়িয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে পতাকাটার পাশে একজন পুলিশ কিংবা আর্মির লোককে পাহারায় বসানো হয়েছিলো। একদিন সকাল বেলা দেখি সেখান থেকে আমাদের আমগাছে টানানো কালো পতাকাটা লক্ষ্য করে অবিরাম গুলি চালানো হচ্ছে। গুলির আঘাতে গাছের কচি আমগুলো নিচে ঝরে ঝরে পড়ছিলো। আমরা ছোটরা সেগুলো মহা আনন্দে কুড়িয়েছি। গুলিতে গুলিতে এক সময় পতাকাটার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। শুধু পতাকা টানানোর বাঁশটা বেশ ক'দিন গাছের ডালে সঙ্গে বাঁধা ছিলো।'

শান্তা চোখ বড় বড় করে বললো, 'আপনার তো দেখছি একাত্তরের অনেক অভিজ্ঞতা আছে!'

শান্তার কথায় আমার হাসি পেলো। বললাম, 'আমার যে অভিজ্ঞতা, তা কারো কাছে প্রকাশ করবার মত না!'

শান্তা প্রতিবাদ করে বলে, 'তবুও সেটা কম না! কারণ পাঁচ-ছয় বছরের শিশু অনেক কিছুই মনে করতে পারে না। তবুও তো আপনার স্মৃতির ভান্ডার একেবারেই শূন্য নয়!'

বললাম, 'যে টুকুই মনে আছে, তাও বেশির ভাগ আজ এলোমেলো। আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে চলে আসে। এক ঘটনার সঙ্গে আরেক ঘটনা গুলিয়ে যায়। তাই পারতঃপক্ষে কারো কাছে বলি না!'

শান্তা আগ্রহ ভরে চেয়ারটা টেনে আরো সামনে এগিয়ে আসে। বলে, 'আরো বলেন না। শুনতে ভালো লাগছে! শুনেছি একাত্তরে আমাকে কোলে

নিয়ে রাতের অন্ধকারে মা আমাদের গ্রাম ছেড়ে আরেক গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিলেন!'

আমাকে চুপ থাকতে দেখে শান্তা বললো, 'পি-জ মমিন ভাই, বলেন না শুনি! আমার খুবই ভাল-াগছে! যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল তখন কোথায় ছিলেন?'

'যুদ্ধের বেশ কিছুটা সময় আমরা ঢাকাতেই ছিলাম। তখনও যুদ্ধটা এত ব্যাপকভাবে হয়তো ছড়িয়ে পড়েনি। কেবল আকাশ যুদ্ধ দেখতাম। পাকিস্তানী কালো জেট বিমানের সাথে ভারতীয় রুপালী রঙের চকচকে বিমানের ছুটোছুটি। অলকা নামে আমারই সমবয়সী একটি ফুটফুটে মেয়ে ছিলো। ওর বাবাকে সবাই ভুঁইয়া সাহেব বলতো। অবশ্য অলকাদের পরিবারের অন্যান্যরা যেমনই হোক তাদের মায়ের কোনো তুলনা হয় না। আমরা তাঁকে খালাম্মা বলে ডাকতাম। তাঁর প্রথম ছেলে, অকাল মৃত্যু এসে যুবক বয়সে যাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সেই ছেলের ডাক নাম আর আমার ডাক নাম এক হওয়ার কারণে তিনি একটু বেশিই যেন স্নেহ করতেন আমাকে। কিন্তু ওই পরিবারটির অন্যান্য সদস্যরা মনে হয় ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করতো না!অলকার বড় একটা ভাই ছিলো রবিন করে নাম। খুবই শয়তান প্রকৃতির! ওদের বাগানের কাছাকাছি আমাকে দেখতে পেলেই গাছের আড়াল থেকে আমাকে ঢিল ছুঁড়তো। একবার মাথায় ইটের টুকরো লেগে রক্ত বেরিয়ে এসেছিলো। তা ছাড়া তাদের ঘরে মিলাদ থাকলে অলকার বড় বোন শীলা বা নীলা কেউ একজন এসে বলতোই, মমিন, আম্মা তোকে যেতে বলেছে! অনেক সময় আমার ভাইদের কেউ রাতের বেলা বের হতে না দিলে ওরা জোর করে আমাকে নিয়ে যেতো। এখন এত বছর পর আমার মনে হয় যে, আমাকে বাদ দিলে যেন সেই সময়টাতে ওদের পারিবারিক মিলাদের অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ হতো না। তবে এর জন্য মাঝে মধ্যে আমাকে যথেষ্ট হেনস্থাও হতে হয়েছে। হালকা-পাতলা স্বাস্থ্যের নীলা আমাকে তেমন জ্বালাতন করতো না। কিন্তু মোটা-সোটা ভালো স্বাস্থ্যর অধিকারিনী শীলা আমাকে খুব একটা সহ্য করতে পারতো না বলে সুযোগ পেলেই তার পায়ের স্পঞ্জের স্যান্ডেল দিয়ে পিঠে আস্তে করে আঘাত করে বলতো, অ্যাই, তুই আমাদের বাসায় আসিস কেন? তুই আসলেই মা তোকে বেশি আদর করে। তুই আর আসবি না!

শীলার কাজ-কারবারে আমি খুবই অপমানিত বোধ করতাম। তাই একবার রাগ করে তাদের বাসার একটা মিলাদের অনুষ্ঠানে যেতে চাইনি। আমাকে নেবার জন্য নীলা এলে তাকে বলেছিলাম, যাবো না। তোমাদের ঘরে যাই

বলে শীলা আমাকে স্যান্ডেল দিয়ে মেরেছে! সে রাতে নীলা ফিরে গিয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পর ভুঁইয়া সাহেব নিজেই চলে এসেছিলেন। হয়তো এ নিয়ে শীলাকে কিছু বলে থাকবেন হয়তো। যে কারণে পরে যে ক'দিন ওদের পড়শী হয়ে ছিলাম, শীলা কখনো আমার গায়ে আর হাত তোলেনি।

দিন তারিখ বলতে পারবো না। সেটা প্রথমবার গ্রামে যাবার আগে বা পরে তাও ঠিক করে বলতে পারবো না। একদিন দুপুরের দিকে রবিনের বোন অলকা হাফপ্যান্ট পরনে খালি গায়ে কেমন নাচতে নাচতে আসছিলো আর হাত উপরের দিকে তুলে কিছু বলছিলো। খেয়াল করতেই বুঝতে পারলাম ও বলছে, ঢাকা না পিন্ডি! ঢাকা! ঢাকা!

আমি এসবের কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, কী বলছিস?

ও বলেছিলো, মিছিল করছি। গোল টেবিল বৈঠক হবে পিন্ডিতে না, ঢাকায়।

অলকাকে আমার চাইতেও বুদ্ধিমতী বলে মনে হলো। মনে হলো, সে আমার চাইতে কত বেশি জানে! আর সে তুলনায় আমি কিছুই জানি না! নিজকে খুবই ছোটো আর অধম বলে মনে হচ্ছিলো। ততদিনে দেশে নাকি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। রোজই আকাশ যুদ্ধের খবর পাওয়া যায়। বড়দের আলাপ থেকে অনেক ধরনের কথাই শোনা যায়। এতদিন আকাশ যুদ্ধের গল্প শুনেছি কেবল। চোখে দেখার সুযোগ হয়নি কখনো। অলকা একটা বিল্ডিং এর পাশে ছায়ায় বসে নাক-ফুলের মত দেখতে ঘাসের সাদা সাদা ফুলগুলো ছিঁড়ছিলো। এমন সময় আকাশে যুদ্ধ-বিমানের শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকালাম। দু'টো বিমান। একটি কাল্‌চে ধরনের ভোঁতা নাক অলা পাকিস্তানি বিমান। অন্যটা সরু নাকঅলা রুপালী রঙের ভারতীয় বিমান। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে বারবার। দু'টোই পরস্পরের দিকে গুলি ছুঁড়ছিলো। অলকা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, মমিন! গুলির শব্দ পাচ্ছো?

বললাম, হ্যাঁ।

একটা উর্দুভাষী ছেলে বিমান দুটোর মহড়া দেখে উৎফুল- হয়ে উঠলো।

আমরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। বিমান দুটো পরস্পর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চালাচ্ছে। কখনো ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনো ডিগবাজি খাচ্ছে। কখনো বা গোত্তা খেয়ে নিচে নেমে আবার খাড়া উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ভারতীয় বিমানটা যখন গোত্তা খেয়ে নামে তখন ছেলেটার উল-াস দেখবার মত হয়। সে দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলতে থাকে, গিরা দিয়া! গিরা দিয়া! কিন্তু

ওটা আবার একটা ডিগবাজি খেয়ে খাড়া উপরের দিকে উঠলে তার মুখটা কালো হয়ে যায়। এমনি করে খাড়া উপরের দিকে উঠবার সময় পাকিস্তানী বিমানটার পেছনের দিকটা ভেঙে নিচের দিকে পড়ে গেল। আর বাকি অংশটা কাত হয়ে কৌণিক ভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে জ্বলতে জ্বলতে হারিয়ে গেল। উর্দুভাষী ছেলেটা বলে উঠলো, হায় হায়! টুট গিয়া? আমার মনে হয়েছিলো সে বুঝি কেঁদেই ফেলবে!

অলকা মহা খুশিতে হাত তালি দিয়ে উঠতেই আমি তাকে বললাম, এই চুপ! চুপ!

অলকা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। একবার ফিরে তাকালাম ছেলেটার দিকে। মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। বললাম, ওই মাউড়াটা শুনতে পাবে তো! ওরা সবাই পাকিস্তানের সাপোর্টার। শুনতে পেলে ঘর থেকে ছুরি নিয়ে আসবে!'

শান্তা হঠাৎ কথার মাঝখান দিয়ে বলে উঠলো, 'মাউড়া মানেটা কি?'

বললাম, 'কথাটা সম্ভবত এসেছে মাড়োয়ারী শব্দ থেকে। তবে সাধারণত উর্দুভাষী লোকগুলোকেই তখন মাউড়া বলতো সবাই।'

'ও! শব্দটা কখনো শুনিনি তো, তাই জিজ্ঞেস করলাম!'

শান্তার মুখে বোকা বোকা হাসি ফুটে উঠলো।

কথার মাঝখান দিয়ে শান্তার ভিন্ন একটা বিষয়ের জবাব দিতে গিয়ে আমি কি নিয়ে কথা বলছিলাম তার খেই হারিয়ে ফেলে চুপ হয়ে যাই।

শান্তা বললো, 'তারপর কি করলো অলকা?'

বললাম কোথায় যেন শেষ করেছিলাম?

শান্তা মনে করিয়ে দিতে বললো, 'বললেন যে, ওরা সবাই পাকিস্তানের সাপোর্টার।'

আমি একটু ভেবে নিয়ে আবার বলি, 'অলকা তখন ফিসফিস করে বলেছিলো, মাউড়াগুলো কি সবাই খারাপ?

বলেছিলাম, আমাদের মহল-ার সব মাউড়াই খারাপ! এরা বাঙালীদের পছন্দ করে না। ঝগড়া লাগলে ছুরি চাকু নিয়ে বের হয়। আমাদের কেটে ফেলবে বলে ভয় দেখায়।

চকচকে রূপালী বিমানটা কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে যেন বিজয় উল-াস করলো। তারপর চলে গেল আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে।'

শান্তা চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ।

তারপর বললো, 'যখন যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গেল, মানে পাকিস্তানী আর্মি আর রাজাকাররা যখন ঘরেঘরে হানা দিতে শুরু করলো, তখন কোথায় ছিলেন? বা আপনারা কি করলেন?'

বললাম, 'যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে, তখন একবার শহরে গুজব শোনা গেল যে, পাকিস্তানী আর্মি বা রাজাকাররা মহল-ায় আগুন দিতে পারে। সে ভয়ে অনেকেই শহর ছেড়ে চলে গেল। ভূঁইয়া সাহেবও তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু বাবা রেলওয়ের অয়ারলেস অপারেটর ছিলেন বলে তাঁর ওপর সরকারি ভাবেও একটা চাপ ছিলো। শহর ছেড়ে যাবার সুযোগ ছিলো না। ভয় ছিলো যে, পালাতে গেলে গুলি করে দিতে পারে। তখন কুমিল-ার একটা পরিবারকে আমরা জানতাম। তারা রেলওয়ের একটা লাল বিল্ডিঙে থাকতো। দাউদকান্দি থানার দশপাড়া অথবা বারোপাড়া বলে কোনো এক গ্রামে ছিলো তাদের বাড়ি। তো, সেই পরিবারটার একজনকে আরো বেশি করে চিনতাম। তিনি রশিদ ভাই। কাঁচকাঁচার রমনা মেলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমান ওসমানী উদ্যানের একটা অংশের নাম ছিলো ডিটিএস মাঠ। সে মাঠে প্রতি বিকেলে আমাদের মত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পিটি-প্যারেড করাতেন। ডাম্বেল, লাঠি খেলা, নানা রকম শারিরীক কসরৎ শেখাতেন। তাঁর বাবা একদিন আমার বাবার হাতে ঘরের চাবিটা দিয়ে বললেন, আমরা গ্যারাম দ্যাশে যাইতাছিগা। পারলে খেয়াল রাইখ্যেন। সবই রইলো। বাইচ্যা থাকলে দ্যাহা অইবো। দোয়া কইরেন। বাবা-মা নিজেদের এবং সন্তানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই হয়তো তাঁদের চোখের জলে বিদায় জানালেন। তাঁরা চলে যাবার কিছুদিন পর শহরের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। কারফিউ জারি করা হলো আবার। রাতে ঘরের ভেতর বাতি জ্বালানো বারণ ছিলো। যার ফলে, ভয়ে আমরা বেড়ার ঘর ছেড়ে দিয়ে রশিদ ভাইদের বাসায় গিয়ে উঠলাম। সে এক বিভিষীকাময় কাল।

আমার মানসপটে সে সময়ের স্মৃতি দোলা দিয়ে যেতেই মনে মনে শিউড়ে উঠলাম।

শান্তা হয়তো ব্যাপারটা খেয়াল করেছিলো। বললো, 'ঘটনাটা কি খুবই খারাপ?'

ঘটনা যেমনই হোক, তার চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাটা ছিলো আরো ভয়াবহ! শান্তা, আপনি কি অনুভব করতে পারেন? একটা ঘরে আট-দশজন মানুষ গাদাগাদি অবস্থায় বাস করছে। ভেতর থেকে দরজা-জানালা সব বন্ধ। দিন

রাত হ্যারিকেন জ্বলছে মিটমিট করে। ভয়ে হ্যারিকেনের সলতে বাড়ানো যাচ্ছে না। যদি জানালার ফাঁক গলে বাইরে আলো যায়! শব্দ করে কথা বলা যাচ্ছে না। ব্যথা পেলে কান্না করা যাচ্ছে না। একটু শব্দ হলেই মা মুখে হাত চাপা দিয়ে বলছেন, অ্যাই চুপ-চুপ! মায়ের হাতের চাপে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। প্রতিবাদ করতে পারি না। বাইরে হানাদারদের ভারি বুটের শব্দ। এই বুঝি দরজা ভেঙে ওরা ঘরের ভেতর চলে এলো। ভয়টা অবশ্য গুলি খেয়ে মরবার জন্য ছিলো না। শুনেছিলাম হারামজাদারা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের এক ঠ্যাং পা দিয়ে চেপে আরেক ঠ্যাং ধরে টেনে ছিঁড়ে দু'ভাগ করে দু'দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতো। সেই যে দু'ভাগ হয়ে মরবার যন্ত্রণা, তা কল্পনায় ছিলো আরো ভয়াবহ। আমার ভাবনা হতো যে, দু'দিকে আমার দু'হাত পা যদি পড়ে থাকে, তাহলে মাথাটা থাকবে কোন দিকে? নাকি মাথাটাও অমন চিড়ে দু'ভাগ হয়ে যাবে? ভিন্ন ভিন্ন দু'টো চোখ দিয়ে বিচ্ছিন্ন আমাকে দেখতে পাবো? হৃৎপিন্ড-কলজে নাড়ি-ভূড়ি এগুলোর কি হবে? বেশিক্ষণ ভাবতে পারতাম না। তখন প্রচন্ড ঘুম পেতো। আমাদের খাবারের জন্য কিছু ছিলো না। দোকানে কিছু কিনতে পাওয়া যেতো না। বাইরে যতই বিপদ থাকুক না কেন, মানুষ আরো ঘোরতর বিপদেও পেটের ক্ষুধার কথা ভুলতে পারে না। ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণের জন্য তাকে আহার্য গ্রহণ করতেই হবে। পেট বিপদ-আপদ বোঝে না। তার চাই খাবার! মানুষ বেঁচে থাকলে তাকে খাদ্য গ্রহণ করতেই হবে। আমাদেরও ক্ষুৎ-পিপাসা ছিলো। কাজেই ঘরে রশিদ ভাইদের রেখে যাওয়া চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ কিছু কিছু পরিমাণে অবশিষ্ট ছিলো। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, শলা-পরামর্শ, যুক্তি-বিবেচনার পর মা সেখান থেকে কিছু কিছু রান্না করলেন। লাকড়ি বা কয়লা দিয়ে রান্না করা ছিলো বিপদজনক। কারণ ও দু'টো দিয়ে আগুন ধরালে তা থেকে ধোঁয়া বের হবে। আর ধোঁয়ার উৎপত্তি মানেই হানাদারদের জানিয়ে দেয়া যে, এখানে মানুষ আছে। ফলে, তাদের বন্দুকের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কাজেই কেউ চাইতো না শুধু শুধু নিজেদের ওপর বিপদ ডেকে আনতে। কেরোসিনের চুলোয় রান্না হতো। আমরা অল্প অল্প করে তা খেয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম। কয়েকদিন পর অবশ্য কারফিউ তুলে নেয়া হয়েছিলো। আমরা তখন হাজার হাজার শহরত্যাগী মানুষ-জনের ভিড়ে মিশে গিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।'

শান্তা আদুরে কণ্ঠে বায়না ধরলো, 'বলেন না, আপনারা কী ভাবে দেশের বাড়ি গিয়েছিলেন?'

আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। কারণ তখনকার আরো ছোট ছোট ঘটনা আমার স্মৃতি পটে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিলো। বললাম, 'আজ অনেক কথা বলেছি। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। আর কিছু বলতে পারবো না!'

শান্তার মনটাও হয়তো খারাপ করে দিলাম। তার মুখটা কালো হয়ে গেল। বললো, 'আপনার তো কিছুটা হলেও অভিজ্ঞতা আছে। আমার কী অভিজ্ঞতা আছে? আর আপানারা যদি না বলেন তো আমরা এসব কোত্থেকে জানবো?'

শান্তার আর্তি উপেক্ষা করতে পারি না। বলি, 'আজ আর বলতে ইচ্ছে করছে না। অন্যদিন বলবো!'

শান্তা উঠে দাঁড়িয়ে কেমন অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আরেকদিন ঠিক এমন কোনো একটা দিনে আমি বাকি ঘটনাগুলো শুনতে চাইবো। সেদিন কিন্তু না করতে পারবেন না!'

'বলবো! অবশ্যই বলবো! সেদিন যদি কোনো কারণে আমার মন খারাপ থাকে, তাহলে কিন্তু অনুরোধটা করবেন না। পি-জ!'

'আচ্ছা। মনে থাকবে। কিন্তু আমি ভাবছি এমন সুযোগ আর পাবো কি না!'

বললাম, 'অবশ্যই পাবেন!'

শান্তা হেসে মাথা দোলালো।

আর তখনই আমার মনে হলো যে, শান্তা বেশ সুন্দরী। তবে তার কপালের ডান দিকে ছোট্ট একটা কাটা দাগ রয়েছে। অফিসে ঢুকতে বা বের হয়ে যাবার সময় প্রায়ই তাকে দেখি। কিন্তু ওই কাটা দাগটা কখনোই আমার চোখে পড়েনি। একবার ইচ্ছে হয়েছিলো তাকে জিজ্ঞেস করি যে, দাগটা কী করে হলো?

কিন্তু ইচ্ছেটা চেপে রাখলাম। কারণ বেশিরভাগ মেয়েই ছেলেদের অহেতুক কৌতূহল ভালো চোখে দেখে না। যদিও আজকের আলাপের ভেতর দিয়ে সে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। তবুও তাকে কিছুটা সময় দেয়া উচিত। কারণ মানুষ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কোনো স্বার্থে অথবা কোনো একটা ভালো গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। শান্তার চোখে আমার তেমন কোনো গুণ ধরা পড়েছে কিনা বা তার মনে কোনো স্বার্থ চিন্তার উদ্ভব হয়েছে কি না তা আমার অজানা।

সেদিন শান্তার কথামত অফিস ছুটির পর রাত আটটা পর্যন্ত বসে থেকেও চীফের দেখা পাইনি। তার মোবাইলে ফোন করতেই জানা গেল তিনি ঘরে

রেস্ট নিচ্ছেন। শান্তাকে তিনি জানিয়ে ছিলেন আমাকে অপেক্ষা করতে। আর সে কথাটা মনে করিয়ে দিতেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, মিটিং সেরে ফিরবার সময় ব্যাপারটা একদম ভুলে গিয়েছিলেন। মন খারাপ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু পরদিন অফিসে এসে আমার কাঁধে এমন কাজের বোঝা চাপালেন যে, পরপর দু'টো দিন টেবিলে থাকা অবস্থায় মনিটর থেকে চোখ সরাতে পারলাম না। শান্তাকে বলে দিয়েছিলাম আমার কোনো ফোন এলে নোট রাখতে। কেবল রায়না ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিগত ফোন যেন আমাকে না দেয়। বুদ্ধিমতী মেয়ে শান্তা। ইম্পর্টেন্ট মনে করে কাগজে টুকে রেখেছিলো। ফোনটা করেছিলো রায়নার ভাইয়ের ছেলে অর্নব। বলেছে দু'একদিনের মধ্যে তার নানার বাড়ি যেতে হবে। খুবই জরুরী।

কাগজটা গোল-া পাকিয়ে ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিতেই শান্তা তার জিজ্ঞাসু চোখ দু'টো তুলে ধরলো।

বললাম, 'রায়নার ভাইয়ের ছেলে। মায়ে-ছায়ে মিলে নানার বাড়ি রাজেন্দ্রপুর থাকে।'

শান্তা বললো, 'এই ঢাকা গাজীপুর পেরিয়ে রাজেন্দ্রপুর?'

'হ্যাঁ। খেজুরবাগ।'

'ওখানে আমার এক খালার বাড়ি আছে। মাস্টার বাড়ি।'

'ওটা মেন রোডের কোন দিকে?'

'পশ্চিম দিকে।'

বললাম, 'ওদের বাড়িটা আবার রাস্তার পূর্ব দিকে।'

'তাহলে চিনতে পারবো না!'

আমি ভাবছিলাম, অর্নব কেন ফোন করলো? তার বাবা পল্টু ভাই কি গ্রাম থেকে ফিরে আসেনি? তার ভাই-বোন-মা? ওরা সুস্থ আছে তো?

আমার ভাবনার ছাপ বোধ হয় আমার অবয়বে ফুটে উঠেছিলো। আর তা দেখেই শান্তা বলে উঠলো, 'কোনো সমস্যা?'

'এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না!'

'আপনার একবার যাওয়া উচিত!'

'আজ তো যাওয়া হবে না! নিলয়টাও যদি থাকতো, না হয় একবার ঘুরে আসতে পারতাম। আগামীকাল ছাড়া হচ্ছে না!'

'আমাকে সঙ্গে নেবেন?'

বেশ অবাক হয়ে মুখ ফসকে বলে ফেলি, 'আমার সাথে?'

'কোনো অসুবিধা আছে?'

ঘাড় বাঁকা করে বলে শান্তা।

কিছুটা ভাবনায় পড়ে গেলাম। বললাম, 'আপনি যাবেন?'

'একসাথে রাজেন্দ্রপুর গিয়ে বাস থেকে নামলেই তো পথ আলাদা হয়ে যাবে। আপনার অসুবিধাটা কোথায়?'

'এখন অসুবিধা নেই!'

'আগে অসুবিধা ছিলো কেন?'

'ভেবেছিলাম, আমার সঙ্গে খেজুরবাগ যেতে চাইছেন।'

শান্তা হাসলো, 'তাই বলেন!'

তারপর আবার বললো, 'আমি আপনার সঙ্গে গেলে আপনার ভাবি তার ননদের কাছে গল্পটা বলে দেবে! আর এই ভয়ে প্রথমটায় ঘাবড়ে গেছিলেন?'

সত্যিটা আড়াল না করেই বললাম, 'ঠিক তাই!'

'এত ভীতু আপনি? না কি বউকে ভয় পান?'

'বউকে ভয় পাই না। তবে সংসারের অশান্তিকে ভয় পাই!'

'আপনি দেখছি ঘরের বউয়ের কাছে ততটা বিশ্বস্ত নন!'

আমি জবাবটা একটু বাঁকা করে দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তখনই বসের রুম থেকে ডাক ভেসে এলো, 'মমিন মিয়া!'

শান্তাকে আর কিছু বলা হলো না।

বস জানতে চাইলেন, 'কাজ কদ্দুর?'

'প্রিন্ট দিতে যতটা সময় লাগবে!'

তিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। আবার চেক করেন। শনিবারে দিলেই হবে!'

'আচ্ছা!'

আমি তাঁর রুম থেকে বের হবার সময় তিনি আবার পিছু ডাকলেন। আমি ফিরে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'নিলয় কি আজও আসেনি?'

'জ্বি না!'

'ফোন করেছিলো?'

'তাও না!'

'আচ্ছা যান!'

বসের রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই শান্তা জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার কি বললো?'

'জিজ্ঞেস করছিলেন যে, আপনার সঙ্গে কী এত কথা?'

আমি যে মিথ্যে বলছি শান্তা বুঝতে পারলো না। চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। গাল দু'টোতেও কেমন লালচে আভা ফুটে উঠলো। ভয় আর লজ্জা মিলে মিশে একাকার।

শান্তা বললো, 'ছি ছি! এখন কি হবে? তিনি এখন কী না কি ভেবে বসে আছেন কে জানে! ওহ!'

কেমন হাত-পা ভাঙা মানুষের মত সে নিজের চেয়ারে বসে পড়লো ধপ্ করে।

তারপর দু'হাতে মাথা চেপে ধরলো।

মনে মনে হাসলাম আমি। কিছুক্ষণ পর অবস্থা বেগতিক দেখে বললাম, 'আরে আপনি অমন করছেন কেন? আমি তো মিথ্যে বলেছি! বস নিলয়ের কথা জানতে চাচ্ছিলেন!'

তারপর শান্তা যা করলো, তা আমার বা তার জন্য অপ্রত্যাশিত। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে দু'হাতে আমার বুকের কাছে শার্ট খামচে ধরলো। তারপর ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো, 'লায়ার! হাউ ডেয়ার ইউ টু টিজ মি?'

আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি শান্তার মুখের দিকে।

হয়তো আরো কিছু বলতো শান্তা। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন সে তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো। বা কি ধরনের আচরণ করছে সেটা বুঝতে পেরেই আমার সার্ট ছেড়ে দিয়ে বললো, 'সরি!'

তারপর দু'হাতে মাথার দু'পাশ চেপে ধরে নিজের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে রইলো।

আমি কিছু বললাম না। চুপচাপ নিজের সিটে এসে বসে থাকলাম। ভাবছিলাম, শান্তা কেন অমন হয়ে গেল? আর আমার কথাটাকেই বা অমন গুরুত্ব দিয়ে বসলো কেন? ভেবে থৈ পাচ্ছিলাম না। অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমার মনে হলো যে, আগে কখনো এমন ধরনের কথা-বার্তা বলিনি বলেই এমনটা হয়েছে। কথাটাকে সিরিয়াস ভাবে নিয়েছে। যার ফলে ভয়-লজ্জা কাটিয়ে উঠেই হিংস্র হয়ে উঠেছে। মনে মনে ঠিক করলাম যে, কারো সাথে হঠাৎ করে এ ধরনের আচরণ করা যাবে না। তাতে উল্টো ফল হতে পারে। এই যেমনটা ঘটে গেল শান্তার ক্ষেত্রে।

আমার মন খারাপ হয়ে গেছিলো বলে কোনো কিছুতেই আর মন বসাতে পারছিলাম না। বসে থেকে শুধু শুধু কষ্ট পাবার চেয়ে বরং বেরিয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

বসের রুমে গিয়ে তাঁর টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই তিনি ফাইল থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বললেন, 'আবার কি?'

'আমি আজ চলে যেতে চাচ্ছিলাম। রাজেন্দ্রপুর একটা কাজ ছিলো।'

তিনি হাতের কব্জি উল্টে ঘড়িতে সময় দেখলেন। বললেন, 'আজকে ফিরতে চাইলে রাত হয়ে যাবে না?'

এবার তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বললাম, কাজ বেশিক্ষণ না। বিশ-ত্রিশ মিনিট। আর আসতে যেতে যতক্ষণ লাগে!'

'ঠিক আছে। শনিবার আরলি চলে এসো!'

আমি তাঁকে সালাম দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে শান্তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। তাকে কিছু বললাম না। ভেবেছিলাম, আগামীকাল সকালের দিকে মাসুমার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। কিন্তু তেমন কোনো জরুরী প্রয়োজন হলে অহেতুক দেরি করবার কোনো মানে হবে না।

বাসস্ট্যান্ডে এসে টিকেট কেটে রাজেন্দ্রপুরের বাসের অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু বাসের জন্য আমার মত আরো অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ লাইন। একটা বাসে সংকুলান হবে কিনা সন্দেহ।

চেরাগ আলি থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত পথটা যে এত বাজে সেটা জানলে কখনোই এদিককার পথ মাড়াতাম না। ভাঙ্গা-এব্ড়ো-থেব্ড়ো রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে মনে হচ্ছিলো আমার শরীরের হাঁড়-মাংস আলাদা হয়ে যাবে। এই যে আমাদের দেশে রাস্তা সংস্কারের দায়িত্বে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, এরা সারা বছর করে কি ভেবে পাই না! বছরের পর বছর একটা রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা অথচ কোনো উদ্যোগ নেই। লোকজনও ইদানিং কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। কারো কোনো রকম প্রতিক্রিয়া নেই। সবাই যেন মুখে আঙ্গুল চাপা দিয়ে কিছু না বলবার পণ করে বসে আছে। রাজেন্দ্রপুর বাস-স্ট্যান্ডে নেমেও আরেক ঝামেলা। এখন কোন পথে যে, যাবো তা আর ঠিক করতে পারছিলাম না। খেজুরবাগ যাবার রাস্তা আছে দু'টো।

একজন রিকশাঅলা এগিয়ে এসে বললো, 'কোই যাইবেন আফনে?'

বললাম, 'খেজুরবাগ হাউজিং।'

'কার বাড়ি?'

'বললে চিনবা?'

'কন না!'

বললাম, 'লতিফ শিকদার।'

'চিনি। হ্যাগো ওষুধের দোকান আছে! হ্যার এক মাইয়ার জামাই প্রফেসার!'

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

রিকশাঅলা বললো, 'আফনে উডেন!'

রিকশা এগিয়ে চলে লাল মাটির রাস্তা ধরে।

আমি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলি, 'ঠিক চিনেন তো?'

'চিনমু না ক্যান? শিকদার বাড়ির হাউত্তা পোলা আছিলো। হ্যার বাপ অন্যজন।'

হাউত্তা কথাটা বুঝতে পারি না। কিন্তু কোন অপ্রিয় কথাটা শুনতে হয়, সে ভয়েও কথাটার অর্থ জিজ্ঞেস করি না।

অনেকটা পথ পেরিয়ে যাবার পর একটা আড়াই তলা বাড়ির সামনে গিয়ে রিকশা থামলো। বাড়ির গেটে সাদা রঙ দিয়ে নাম, বাড়ির হোল্ডিং নাম্বার ইত্যাদি লেখা রয়েছে। রিকশা বিদায় করে দিয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে গেটে আলতো ঠেলা দেই। তারপর আরেকটু জোরে ঠেলি। না। ভেতর দিক থেকে বন্ধ। গেটে শব্দ করে টোকা দিয়ে অপেক্ষা করি। কিছু সময় পেরিয়ে গেলেও কারো সাড়া মেলে না। আবার গেটে টোকা দিতে থাকি।

কিছুক্ষণ পর ছোট ছেলে মেয়েদের কলরব শুনতে পাই।

গেট খুলে একটা কাঁচ মুখ বাইরে উঁকি দেয়।

পল্টু ভাইয়ের ছোট ছেলে। পেছনে বড় মেয়েটার মুখ। আমাকে দেখতে পেয়েই ওরা মহা উল-াসে তাদের মায়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে, 'আম্মা, মমিন আংকেল আসছে!'

তাদের চিৎকারে এমন কিছু ছিলো যে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। যাদের সবার মুখ আমি চিনি না। পেছন থেকে অর্নবের মা মাসুমা জিজ্ঞেস করলো, 'কে রে?'

মুখ বাড়িয়ে বললাম, 'কি ভাবি! চোখে ছানি পড়লো নাকি?'

মাসুমা বললো, 'ছানি না পড়লেও পড়তে কতক্ষণ। অনেক দিন কাউকে না দেখলে চেহারাই তো ভুলে যাবার কথা!'

বললাম, 'ভুলে যাননি তো?'

মাসুমার মুখে হাসি দেখা গেল। বললো, 'ভেতরে আসেন। আর ক'দিন হলে ঠিকই ভুলে যেতাম!'

পাশে দাঁড়ানো একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে হাত তুলে মাসুমা বললো, 'আমার আব্বা!'

'আসসালামু আলাইকুম!'

ভদ্রলোক তাঁর দৃষ্টিতে কেমন সন্দেহ নিয়ে আমার সালামের জবাব দিলেন।

মাসুমা ব্যাপারটা খেয়াল করে বললো, 'আব্বা কি মমিন ভাইকে চিনতে পারেন নাই?'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'বুঝতে পারলাম না!'

মাসুমা বললো, 'রায়নার হাজবেন্ড! বিয়েতে দেখেন নাই?'

তাঁর মুখে হাসি ফুটলো। 'চিনতে পারছি!'

তারপর আমার একটা হাত ধরে তিনি বললেন, 'আপনি ভালো আছেন বাবা? বাড়ির সবাই ভালো?'

প্রত্যুত্তরে আমি মাথা দোলাই।

ইনিই পল্টু ভাইয়ের শ্বশুর! লতিফ শিকদার। রিকশাঅলার ভাষায় শিকদারের হাউত্তা পোলা। মুখ ভর্তি ঘন চাপ দাড়ি। বয়স হয়ে গেছে। তবু এখনও তিনি সুদর্শন। বললেন, 'এখন কোত্থেকে এলেন? গ্রাম থেকে?'

বললাম, 'না। ওখানে যাবার সময় হয়নি!'

শিকদার সাহেব বললেন, 'ওই জমিদারের বাচ্চা কি করছে এখন? ঢাকায় না গ্রামে?'

বুঝতে পারলাম, তিনি তার জামাই পল্টুর কথাই বলছেন। বললাম, 'পল্টু ভাই তো এখন গ্রামের বাড়ি আছে!'

'কি করছে ওখানে? বাপ-মার পা চাটছে না? ওই শুয়োরের বাচ্চা কি ভুলে গেছে যে, ওর বউ-বাচ্চা পড়ে আছে অন্যের বাড়িতে? আরে তুই টাকা পয়সার অভাবে না হয় খোঁজ-খবর নিতে পারিস না, একটাকা দিয়ে একটা পোস্টকার্ড কিনে তাতে দু'কলম লিখে পাঠিয়ে দে! তাহলেই তো আমরা বুঝতে পারি যে আমার মেয়ে বিধবা হয়নি!'

এরা কেন যে এতটা রেগে আছে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মাসুমা বললো, 'আব্বা! ও পরের ছেলে। ওকে এসব শুনিয়ে তো আমাদের লাভ হবে না!

'আরে হবে! ও বাড়ি গিয়ে কি কথাগুলো ওই শুয়োরের বাচ্চাকে বলবে না?'

আমার খুবই রাগ হচ্ছিলো। এরা কি সৌজন্যের ব্যাপারগুলোও ভুলে গেছে? নাকি পুরোটা পরিবারই এমন বুনো প্রকৃতির? আরে, তোমাদের যতই রাগ-বিদ্বেষ থাকুক না কেন, তা আমার কাছে বলতে চাইলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কত রকমেই তো বলা যেতো! কিন্তু এভাবে একেবারে চোয়াড়ের মত করে কথাগুলো বলাটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না!

মাসুমা বললো, 'মমিন ভাই, ঘরে আসেন। বসে শুনে যান আমার শ্বশুর-শাশুড়ি-হাজবেন্ডের কীর্তি-কলাপ!'

লতিফ শিকদার বললেন, 'হ্যাঁ মা, সব ভালো করে বলে দে। কোনো কিছুই বাদ দিবি না!'

আমি মাসুমার পেছন পেছন হেঁটে একটা টিনশেড ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। দু'টো রুম। ওদের যা আসবাব ছিলো সবগুলোরই সুন্দর মত জায়গা হয়েছে এখানে। অর্নব আমাকে দেখতে পেয়েই বললো, 'আংকেল, আপনি যাবার সময় আমাকে নিয়ে যাবেন। কত দিন ধরে দাদু বাড়ি যাই না!'

মাসুমা এমনিতেই ক্ষেপে ছিলো তার শ্বশুর-শাশুড়ির ওপর। ছেলের কথায় তা আরো কয়েকগুণ হয়ে গেল যেন। অর্নবের পিঠে একটা থাপ্পড় ঝেড়ে বললো, 'শুয়োরের বাচ্চা, দাদুর বাড়ি যাবা! তোমাদের একবারও খোঁজ-খবর নিলো না আর তুমি যাবার চাও দাদুর বাড়ি? যাওয়াবো জনমের মত!'

নিগৃহীত হয়ে ছেলেটা মুখ গোমড়া করে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মাসুমা বললো, 'আচ্ছা মমিন ভাই আপনিই বলেন, এই যে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়িতে পড়ে আছি, কি খাই না না খাই, ছেলে-মেয়ে নিয়ে কিভাবে আছি, তা কি একবার দেখা ওদের দায়িত্ব না?'

বললাম, 'আপনি তো জানেনই যে, মেয়ে-জামাই হিসেবে আমি তাদের কাছে খুব একটা ভালো মানুষ না! আর সম্পর্কটাও তেমন কাছের না। দুরের মানুষ দুরেই আছি। কাজেই তাদের কাজ-কারবার প-্যান-প্রোগ্রাম কিছুই আমি জানি না। এখন যদি তাদের ব্যাপারে আপনি আমার কাছে কিছু জানতে চান তাহলে সরি বলা ছাড়া কিছু করবার নেই!'

'আমি বিয়ের পর এসে আমার ননদগুলোর জন্য এত করেও ওদের মন পেলাম না। আর কি ভাবে ওদের মন পাবো আমি? তাই ঠিক করেছি অমন বাপ-মার পা-চাটা ছেলের সঙ্গে সংসার করবো না!'

মাসুমার কথা শুনে আমি থ হয়ে গেলাম। কী বলছে এসব? বললাম, 'এসব রাগের কথা! যাই করেন ভেবে-চিন্তে করেন!'

'অনেক ভেবেছি। আমার চিন্তা-ভাবনা শেষ!'

তারপর আবার বললো, 'কী না করেছি ওদের জন্য? আপনি যখন নতুন তখন তো নিজের চোখেই দেখেছেন ওদের জন্য আমি কি করেছি!'

মনে মনে বললাম, কী করেছো দেখেছি নিজের চোখেই। রায়নাকে বিয়ের পর উঠিয়ে নেবার অনুষ্ঠান করেছিলাম দু'মাস পর। মাঝখানের সময়গুলোতে সপ্তাহে দু'তিন দিন যেতাম ওদের ওখানে। হয়তো কোনো কারণে মাসুমা আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো। আমি আর রায়না ঘুমুতাম ড্রয়িং রুমে। সেখানে একটা সিঙ্গেল খাট পাতা ছিলো। একদিন গিয়ে দেখলাম সেখানে খাটটা নেই। রায়নাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, খাটটার কি হলো?

রায়না চুপ করেছিলো। মুখের ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে, এ খাট নিয়ে কোনো একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। নতুন জামাইর কাছে সেটা প্রকাশ করতে চাচ্ছে না। তবু আমি আরো চাপাচাপি করতেই সে বললো, 'ভাবি বলেছে এখানে নতুন আরেক সেট সোফা রাখবে। খাট থাকলে নাকি বিশ্রি দেখায়।'

আমি বুঝতে পারছিলাম যে, ভাবির ইচ্ছে হয়েছে একা একা থাকবার। তাই ননদরা এসে যাতে কোনো হাঙ্গামা করতে না পারে সে জন্যই এ ব্যবস্থা। কারণ, রাতের বেলা ঘুমুতে অসুবিধা হলে স্বভাবতই কেউ থাকতে রাজি হবে না। তা ছাড়া তার আরো অনেক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়েছি আমরা। যা তার চোখে পড়েনি। বা তিনি বুঝতে পারেননি যে এটা স্বেচ্ছাচারিতা।

মমিন ভাই, 'আপনি কি বললে বিশ্বাস করবেন? আজ একটা বছর হয়ে গেল ওদের বাপ কোনো খোঁজ খবর নেয় না! আচ্ছা, থাকা খাওয়াটা না হয় আমার বাবা দেখলো। কিন্তু কাপড়-চোপড়, স্কুলের বেতন, বই-খাতা এসবও কি দেখবে? ওই বদমাশটা যদি একবার আসতো তাহলে জিজ্ঞেস করতাম যে, হারামজাদা তোর ছেলে-মেয়েদের যদি অন্যেই দেখতে হয় তাহলে বিয়ে করেছিলি ক্যান্? তিন তিনটে শুয়োরের বাচ্চা জন্ম দিয়েছিলি ক্যান্?'

সবিনয়ে বললাম, 'ভাবি, আপানার হাজবেন্ডের এখন আয়-রোজগার নেই বলেই সে এমনটা করছে! আবার তো তার কাছে ফিরে যাবেন। আবার সংসার করবেন। শুধু শুধু আজে-বাজে কথা বলে কেন যে মুখটা নষ্ট করছেন বুঝি না!'

'আজে বাজে কথা না! আপনাকে খবর দিয়ে আনিয়েছি কেবল এ কথাটা বলবার জন্য যে, ওই শুয়োরটাকে বলবেন তার ছেলে-মেয়েগুলো যেন এখান থেকে নিয়ে যায়!'

'এটা হলে কি ভালো হবে? আপনি কি শান্তি পাবেন?'

'আমার কপালে এমনিতেই শান্তি নেই! আর শান্তির দরকারও নেই! বাপ-ভাইয়ের ঘরের ফ্লোর মুছলেও আমার বাকি জীবন কেটে যাবে। ও নিয়ে আমি ভাবিনা!'

মাসুমার চোখ দিয়ে পানি ঝরছিলো। সে চোখ মুছে বললো, 'ওই লোকটা যে এতদিন ধরে বাপ-মার কাছে গিয়ে পড়ে রইলো, তার কি একবারও বউয়ের কথা মনে পড়ে না? ওর কি একবারও চিন্তা হয় না যে, তার বউ ঠিক আছে না আর কারো সঙ্গে ভেগে গেছে?'

মাসুমার কথা শুনে আমার মুখে কথা জোগায় না। সত্যিই তো! একটা মানুষ কী করে এতটা দায়িত্বহীন হয়? এমন হলে তো মাসুমা একদিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে যে, এ লোকের সংসারে আর না!

মাসুমা আবার বলে, 'বাচ্চাগুলোর বাপ না হয় কোনো সমস্যার কারণে আসতে পারছে না। কিন্তু তার বোনেরা তো কেউই ফকিন্নি না! তাদের কি উচিত না মাঝে মধ্যে তাদের ভাইয়ের ছেলে-মেয়েদের দেখতে আসা? আরে, তোরা যে একবারও আসিস না, আশপাশের লোকজন শুনলে কি বলে? ওরা কি বলবে না যে, বাচ্চাগুলো বেওয়ারিশ! বাপ বাউন্ডুলে! ওদের আপনজন বলতে কেউ নাই! এলাকায় আমার বাপ-ভাইয়ের যেটুকুই মান-সম্মান আছে তা কি আর থাকবে?'

বললাম, 'এমন হলে থাকে কি করে? লোকজন তো স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চাইবে যে, বিয়ে হয়ে গেছে এমন মেয়ে তার সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ি পড়ে আছে কেন? শ্বশুর বাড়িতে কি অসুবিধা?'

আমাদের কথার এ পর্যায়ে মাসুমার বাবা লতিফ সাহেব এসে বললেন, 'বাবাজি! আপনার সঙ্গে আমাদের রাগ করে কিছু বলা উচিত হবে না। তবে আমি ঠিক করেছি যে, আমার মেয়েকে আবার বিয়ে দেবো! ওই শুয়োরের

বাচ্চার কাছে আর যেতে দেবো না! মেয়ে যদি আমার কথা না শোনে, দরকার হলে জবাই করে ফেলবো। আর আপনি ওদের বলে দেবেন যে, আমার এখানে যে কুকুরের বাচ্চা তিনটাকে পাল-পোষ করছি এগুলোকে যেন এসে নিয়ে যায়। নইলে ঘাড় ধরে দু'দিন পর বাড়ি থেকে বের করে দেবো!'

আমার কাছে পরিবেশটা ক্রমান্বয়ে অসহনীয় হয়ে উঠছিলো। ধীরেধীরে আমিই যেন তাদের আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছিলাম। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। মনে মনে আমি ঘরে ফিরে যাবার তাড়া অনুভব করি।

বললাম, 'ভাবি, যা হয় একটা কিছু তো অবশ্যই হবে। তবে এভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে তো পরে আপনাদের ছেলে-মেয়েদেরই সমস্যা। তারা হারাবে তাদের মা। আপনার আরেক খানে বিয়ে হলেও আপনার আগের ছেলে-মেয়ের জন্য ভেতরে ভেতরে পুড়ে মরবেন!'

মাসুমা আমার কথা শুনে আরো দ্বিগুণ তেজে বললো, 'ও আমার পোড়া রে! বিয়ের পর থেকেই আমাকে পোড়াচ্ছে ওরা। পুড়তে পুড়তে আমার আর বাকি নেই কিছু। মেয়েরা বিয়ে করলে তার স্বামী হয় একটা। আর আমার স্বামী ছয়টা! সবাই মিলে আমার জীবনটাকে কয়লা বানিয়ে দিয়েছে!' বলে, ফ্যাৎ করে নাক ঝাড়লো সে।

তারপর আবার বলতে লাগলো, 'বিশ্বাস করবেন না মমিন ভাই! ঢাকা থেকে আমাকে যখন গ্রামের বাড়ি নিয়ে তুললো, সেখানে চাকরানী কি, তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় থেকেছি! কোনোদিন রাত এগারটা বারটার আগে ঘুমুতে যেতে পারিনি। পরনের কাপড় সপ্তাহে একবার ধুতে পেরেছি। অথচ বলতে গেলে ওদের সংসারে তেমন কোনো কাজই নেই। কিন্তু আমার কাজের অভাব ঘটেনি কোনোদিন। মা-ছেলের কোনো একটা কাজের হুকুম হয়েছে আর কাজটা করতে আমার এক দু'সেকেন্ড দেরি হয়েছে অমনি শুরু হয়ে গেল কিল চড় লাথি! একবার তো মায়ে-ছেলেতে মিলে আমার বিছানায় কেরসিন ঢেলে দিয়েছিলো আমাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে বলে। আমার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এসে আমাকে বাঁচিয়েছে। ওরা তো আমাকে খুন করে ফেলেছে আরো আগেই! আমি যদি বেঁচে থাকি, যদি ভিক্ষে করেও খেতে হয়, তবু পল্টুর সাথে আর সংসার করবো না! এদের পাল-য় পড়ে আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে!'

মাসুমার কথাগুলোকে আমি ধরলাম না। রাগলে মানুষ অনেক ধরনের অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলে। যা পরে নিজেই ভুলে যায়।

আমি উঠে বললাম, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ব্যাপারটা নিয়ে আমি কথা বলবো। আর খুব শিঘ্রিই আমি আপনাদের এখানে আসবো। না হয় ওদের কেউ না কেউ আসবে!'

মাসুমা বললো, 'আপনার আসবার আর দরকার নেই। ওদের পাঠিয়ে দেন! এটাই আমার জন্য সবচে বড় উপকার হবে! এর আগেও তো একবার এসেছিলেন, কিছু করতে পেরেছিলেন?'

তা অবশ্য পারিনি। আজ আবার এসেছি। কিন্তু আমি জানি না কিছু করতে পারবো কি না। তবে মাসুমা চেয়েছিলো তার কষ্টের কথাগুলো কারো কাছে বলে নিজকে হালকা করতে। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বুকের ভার লাঘব করতে। আমার সঙ্গে কথা বলতে পেরে তার সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। আবার বেশ কিছুদিন সে থাকতে পারবে মুখ বুঁজে। বাপের বাড়িতে মা আর ভাইয়ের বউয়ের কটু কথা সহ্য করে, ঘাড় গুঁজে হাঁড়ি ঠেলে পার করে দিতে পারবে আরো কিছু দিন। এরই মাঝে যদি পল্টুর সঙ্গে তার আপস হয়ে যায় কিংবা দু'জনের মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তাহলে আমাকে আর এভাবে এখানে আসতে হবে না। এমন ধরনের জটিল বিষয় নিয়ে অন্যদের সাথে আমাকেও কষ্ট পেতে হবে না!

তাই ঠিক করলাম, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আমি যাবো রায়নার বাপের বাড়ি। মাসুমা যা যা বলেছে সবই বলবো। এতে করে একটা অশান্তির আগুন নতুন করে জ্বলে উঠলেও তা নিভবে এক সময়। হয়তো তাদের জীবনে থেকে যাবে কিছু ছোটখাট পোড়া ক্ষত! আর এ ধরনের কিছু না কিছু ক্ষতচিহ্ন নিয়েই মানুষ যাপন করে তার সমগ্র জীবন!

সংসার বা সামাজিক জীবনে কোনো না কোনো ব্যাপারে কারু মধ্যস্থতার প্রয়োজনকে মানুষ কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীকে কেউ না ডাকলেও অনেক সময় উপযাচক হয়ে সে ভূমিকাটা তাকে নিতে হয়। এ নিয়ে কখনো নতুন করেও দ্বন্দ্ব তৈরী হতে পারে। মধ্যস্থতাকারীর সমালোচনাও করতে পারে অনেকে। সে অবস্থায় আমার ভূমিকাটাও সমালোচিত হলো তুমুল ভাবে।

আমি পল্টুর শ্বশুর বাড়ি গিয়েছি শুনে রায়না যেন ক্ষেপে উঠলো। বললো, 'তোমাকে মাতব্বরি করতে বলেছে কে?'

আমি ভেবে পাই না যে, ওখানে যাওয়াতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! বললাম, 'তোমরা যে ওদের এভাবে আরেক বাড়িতে ফেলে রেখেছো, মাঝে মধ্যে খোঁজ খবর নিতে হয় না?'

'খোজ-খবর তোমাকেই নিতে হবে কেন? আরো তো মানুষ আছে!'

আমার মনের ভেতর মাসুমার বলা কথাগুলো এখনো ঘুরপাক খাচ্ছিলো বলে, আমি উত্তেজিত না হয়ে বললাম, 'দেখ, তোমাদের দায়িত্বগুলো যদি তোমরা ঠিক মত পালন করতে, তাহলে আমাকে আর এসবের মধ্যে নাক গলাতে হতো না!'

রায়নার কপাল কুঁচকে ওঠে। আমার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর বলে, 'তুমি যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না!'

'জানি না মানছি! কিন্তু আমাকে কি জানানোর প্রয়োজন নেই?'

রায়না বললো, 'তোমাকে কতটুকু জানাবো? তার মানে এই না যে, ভাইয়া যেদিন বিয়ে করেছে তার আগের ঘটনাগুলোও তোমাকে বলতে হবে! আর বলতে গেলে তোমার শুনবার ধৈর্য কতটুকু থাকবে সেটাও তো কিছুটা ভাবতে হবে, না কি?'

আমার সে ধৈর্য এবং কৌতুহল যথেষ্ট থাকলেও রায়নার দিক থেকে তেমন উৎসাহ পাওয়া যায় না। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সে তাদের পারিবারিক ব্যাপারগুলোকে চেপে যাওয়াটাই পছন্দ করে। তাই আমিও তেমন জোর করি না। নিজের থেকে যেটুকু বলে তাতেই আমি তুষ্ট থাকবার চেষ্টা করি। সে ক্ষেত্রে রায়না নিজের থেকে অনেক সময় অনেক কিছু বলেও দেয়।

আমাকে ভাবতে দেখে রায়না বললো, 'ভাবি আমাদের উপর খুব এক চোট নিয়েছে, না?'

'সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না!'

'আমি জানি, সে কি বলতে পারে! তবে তার ভুলে যাওয়াটা উচিত হবে না যে, আগের দিনগুলোতে আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছে! নিজের ভাইয়ের বাসায় থেকেছি পরাধীনের মত। সময়গুলো পার করেছি চোরের মত মাথা নিচু করে। তুমি জানো না, ছায়া তখন ছোট। তুমি তো দেখেছোই ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ে। এতটুকু মেয়েটার ক্লাসের পড়া তৈরী করে, সকালে গোসল সেরে স্কুলে যেতে নিশ্চয়ই কম সময় লাগে না! আর সে সময়টুকুও উনি কখনো দিতে চাননি। আমাদের একটু দেরি হলেই দেখা গেছে মুখ চোখ অন্ধকার করে রেখেছেন। বাথরুমে হাড়ি-পাতিল বাসন কোসনের আছাড়ের শব্দে আমাদের

ঘুম ভেঙে গেছে। শরীর অসুস্থ থাকলেও তা কখনো প্রকাশ করিনি কেবল অশান্তির ভয়ে। কারণ ভাইয়াকে যদি এ নিয়ে কখনো বলতাম, তাহলে ভাবিকে মারধোর করতো। মার খেলে ভাবি নামাজের পর জায়নামাজে বসে আমাদের জন্য খারাপ দোয়া করতো। মোনাজাতে বলতো, আমাদের কারো যেন ভালো বিয়ে না হয়। স্বামীরা যেন আমাদের ওপর খুবই অত্যাচার করে। তাই বেশির ভাগ কথাই ভাইয়াকে জানাতে সাহস পেতাম না!'

বললাম, 'তোমাদের স্বামীগুলো কি সবাই আমার মত বদমাশ?'

রায়না বললো, 'সেটা কোনো বিষয় না!'

'ভাবিকে দেখলাম ময়লা আর ছেঁড়া কাপড় পরে আছে। ছেলে-মেয়েগুলোর অবস্থাও তেমন। ওরা তোমার ভাবিকে ঠিকমত খেতে দেয় কিনা সন্দেহ। স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে! চেহারাটা আরো কালো হয়ে গেছে! কেমন পেত্নী পেত্নী মনে হয়!'

'এর সবই তার কর্মফল! এখন যে ভাবি কাঁদছে, বাপের বাড়ি পচে মরছে, সে তার কর্মফল ভোগ করছে এখন। মা-বাবা আমাদের ভাইয়ার বাসায় রেখে দেশের বাড়ি চলে যাবার পর আরো বেশি কষ্ট দিয়েছে আমাদের। সহ্য করতে না পারলে বাড়ি চলে যেতাম!'

বললাম, 'বললে তো কষ্ট পেয়ে বাড়ি চলে যেতে! কিন্তু কী ধরনের কষ্ট? তা তো কখনো বলোনি!'

ভাইয়া সকালে অফিসে যাবার সময় ভাবির কাছে টাকা দিয়ে যেতো বাজার করবার জন্য। ভাবি বাজার করতো না। ঘরে যা থাকতো তা দিয়েই আমাদের বুঝ মানা তো। আর ভাইয়া যাতে ব্যাপারটা টের না পায়, তাই কেবল ভাইয়ার জন্যই ভালো তরকারি রেঁধে লুকিয়ে রাখতো। ভাইয়া খাওয়ার জন্য ভালো-মন্দ কিছু আনলে আমরা কখনোই তার গন্ধও টের পেতাম না। পেলেও আমাদের কিছু করবার থাকতো না। ভাবি বলতো বাচ্চারা খেয়ে ফেলেছে। এভাবে দিনের পর দিন আমাদের সঙ্গে প্রতারণা চালিয়ে গেছে সে। এখন কেন কাঁদে? পুরোনো দিনগুলো কি ভুলে গেছে? তার এই চালাকির কথা আমরা ভাইয়াকে বা মা-বাবাকে কখনোই বলিনি। আজ এর কিছুটা তোমাকেই যা বললাম! এমন আরো অনেক কথা যা বললে রাত ফুরিয়ে যাবে কিন্তু কথা ফুরাবে না!'

রায়নার ফ্যামিলি সম্পর্কে আরো কিছু জানার প্রচন্ড আগ্রহ থাকলেও আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। গাড়ির ধকল তো ছিলোই। তার ওপর ক্ষুধায় কষ্ট

পাবার কারণে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমে চোখ দুটো বুঁজে আসছিলো। সকাল সকাল উঠে আবার অফিসে যাবার তাড়া থাকলে রায়না আমাকে রাত জাগতে দেয় না। তা না পারলে সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু এখন উল্টোটাই ঘটলো।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই কখনো আমার ঘুম আসে না। একটু সময় লাগে। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি রায়নার নাক ডাকা শুরু হয়ে গেছে।

মানুষই মনে হয় পৃথিবীর সব চাইতে আবেগপ্রবণ প্রাণী। আবেগের বশবর্তী হয়ে যে অনেক কিছুই করে বসে। আর সেগুলো পরবর্তীতে তার ওপর বা তার চারপাশেও প্রভাব ফেলে। এই যেমন শান্তা। উত্তেজিত হয়ে গতকাল আমার সার্ট খামচে ধরেছিলো। পরে ব্যাপারটা খেয়াল হতেই সে হয়তো মরমে মরে যাচ্ছিলো। আর সে কারণেই আজ কেমন যেন নিস্তেজ আর বিষন্ন দেখছিলো তাকে। ব্যাপারটা অবশ্য প্রথমটায় বুঝতে পারিনি।

অফিসে ঢুকবার সময় প্রতিদিনকার অভ্যাস অনুযায়ী 'হাই!' বলে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় অকস্মাৎ আমার হাত চেপে ধরলো শান্তা। আমি বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে।

তারপর সে চেয়ার থেকে উঠে আমার মুখোমুখি হয়ে বললো, 'সরি মমিন ভাই!'

প্রথমটায় বুঝতে না পেরে বললাম, 'সরি? কিসের জন্য?'

শান্তা একবার আমার মুখের দিকে চোখ তুলে দেখলো।

তারপর মাথা নিচু করে বললো, 'আসলে গতকাল হঠাৎ কী যে হয়ে গেল বুঝতে পারিনি! আপনার সঙ্গে খুবই খারাপ আচরণ করেছি বুঝতে পারছি! ওটা আপনি ভুলে যান! পি-জ!'

ব্যাপারটা কখনো ভুলতে পারবো বলে মনে হয় না। তবু বললাম, 'পাগল-ছাগলের কথায় আমি কিছু মনে করি না!'

শান্তা এবার আমার দু'টো হাত চেপে ধরলো। বললো, 'আপনি এখনো রেগে আছেন। আমাকে মাফ করে দেন। পি-জ!'

শান্তার ওপর আবার প্রসন্ন হয়ে উঠলো আমার মন। বললাম, 'সময় মত সংসারী না হলে মেয়েদের যা হয় আরকি। আমি আপনার ওপর রাগ করিনি। সত্যি বলছি!'

শান্তা আমার দিকে তাকিয়ে হাত দু'টো ছেড়ে দিয়ে বললো, 'দুশ্চিন্তায় সারা রাত ঘুমুতে পারিনি!'

কথাটা আমার বিশ্বাস হলো। শান্তার চোখে রাত জাগার চিহ্ন ফুটে আছে। বললাম, 'এখন তাহলে টেবিলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারেন। ক্ষতিটা পুষিয়ে যাবে!'

আবার তার সাথে জোক করলাম ইচ্ছে করেই। কারণ তার কাছে এটা পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরতে চাই যে, যে মানুষ জোক করে সে কারো সাথে সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ব্যাপারটা শান্তা বুঝতে পারলো হয়তো। বললো, 'সেটা অবশ্য মন্দ বলেন নি!'

আমি সরাসরি চিফের রুমে গিয়ে ঢুকলাম। তিনি রুমে নেই। তবে টেবিলে একটা কাগজে আমার জন্য নোট রেখে গেছেন। আজ অফিসে আসতে পারবেন না। যা করবার তা হলো খাঁন সাহেবের কিছু কাজ করতে হতে পারে। তবে খাঁন সাহেব কখন আসবেন তা নোটে উলে-খ নেই। প্রতিদিন অফিসে ঢুকেই আমার প্রথম কাজ হচ্ছে তাঁর সঙ্গে দেখা করা। তিনি রুমে না থাকলে আমার জন্য নোট রেখে যাবেন। আর তা যদি না হয় বুঝতে হবে হাতের কাজগুলো শেষ করে অপেক্ষা করা।

ভেবে দেখলাম আজও হাতে তেমন কোনো কাজ নেই। একবার নিলয়ের বাড়িতে ফোন করতে পারলে ভালো হতো। এ কথা মনে হতেই নিলয়ের ভাবনাটা আমাকে আবার পেয়ে বসে। তাই নিজের টেবিলে এসে অন্যান্য দিনের মত আমি কম্পিউটার অন করি না। চুপচাপ বসে খাঁন সাহেবের অপেক্ষায় থাকি।

বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যাবার পর আমার নিরবতার ব্যাপারটা খেয়াল করে শান্তা। সে তার টেবিলের পাশে মুখ বাড়িয়ে আমাকে ডাকলো, 'মমিন ভাই!'

আমি তার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই সে হাতছানি দেয়। কিন্তু ইতস্ততঃ করছি দেখে আবার ঘনঘন হাত নাড়ে।

উঠে তার কাছে যেতেই সে ব্যাগ খুলে একটা পিঠা বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। বললাম, 'পিঠা কিসের?'

'মা বানিয়েছে!'

ব্যাগ বন্ধ করতে করতে বললো সে।

পিঠাটা দেখতে বিস্কুটের মত। কিন্তু আমার কাছে অপরিচিত। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটার নাম কি?'

'সঠিক নাম অবশ্য জানি না! বলে, হাসলো সে।

তারপর আবার বললো, 'আমরা এটাকে বিস্কুট পিঠাই বলি!'

পিঠাতে একটু কামড় দিয়ে চিবোতেই দেখি স্বাদ অপুর্ব! কিছুর সাথে তুলনা করতে পারলাম না। তবে এতে ডিম আর কাস্টার্ডের স্বাদ-গন্ধ পাচ্ছিলাম। বললাম, 'আরো আছে?'

শান্তা লজ্জা পেলো যেন। হেসে বললো, 'আর নেই!'

বললাম, 'কিভাবে বানায় এটা? জানলে অবশ্য ঘরে গিয়ে বউকে বলতে পারতাম!'

'আপনার ভালো লেগেছে? তাহলে মাকে বলবো!'

আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'না না, ওটা করতে যাবেন না! ভালো লেগেছে বলে আবার বলতে হবে এর কোনো মানে নেই!'

'তা হবে কেন?'

শান্তার কণ্ঠে অভিমান ফুটে ওঠে।

তারপর আবার বলে, 'নিলয় দা হলে তো সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে যেতেন!'

'সে ক্ষেত্রে হয়তো হয়েও যেতাম! কিন্তু আপনার ব্যাপারটা আলাদা!'

'আমারটা আলাদা কেন?'

'পিঠা বানিয়ে এখানে নিয়ে আসলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর গরম গরম খেলেই আসল স্বাদটা পাওয়া যায়। তাই ভাবছিলাম আপনাদের বাড়ি গিয়েই একদিন পিঠা খাওয়া যাবে!'

শান্তা খুশি হয়ে উঠলো। বললো, 'যাবেন? মা খুব খুশি হবেন। বলেন, কবে যাবেন?'

'তা বলতে পারছি না। নিলয়টার যে কি হলো! ওর কোনো খবর-টবর না পেলে দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারছি না!'

শান্তা বললো, 'আচ্ছা, ওর হয়েছে কি? কোনো যোগাযোগ করছে না কেন?'

'সেটা জানতে পারলে তো হতোই!'

'ওর বাসার নাম্বার জানেন না?'

'না!'

'অথচ আপনার সঙ্গেই ওর খাতির বেশি!'

বললাম, 'আপনিও যেমন! খাতির থাকলেই যে ওর ফোন নাম্বার জানবো সেটা কি করে ভাবলেন?'

'সাধারণতঃ যা হয় আর কি!'

'ও নিজে ইচ্ছে করে আমাকে ফোন নাম্বার দেয়নি। তা ছাড়া ওদের ঘরে ফোন আছে কি না তাও জানি না!'

হাঠাৎ শান্তার সামনের ফোনটা বেজে উঠলো। সে ফোন তুলে ধরে আবার রেখে দিলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বললাম, 'কার ফোন?'

'স্যার আসছেন!'

আমি শান্তার ওখান থেকে ফিরে আমার টেবিলে কাছে বসি। কম্পিউটার অন করে দেই। বস আসছেন। বলা যায় না এসেই কোনো প্রিন্ট চাইতে পারেন। সে ক্ষেত্রে কম্পিউটার অফ করা থাকলে রেগে যাওয়াটাও বিচিত্র কিছু না। নিজকে চৌকস হিসেবে তুলে ধরতে হলে কিছুটা আগাম অনুমান ক্ষমতা আর পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবার দক্ষতাও থাকা চাই!

দু'চার-পাঁচদিন নয়। টানা দশদিন পর অফিসে আসে নিলয়। তাও স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে ঢুকলো। চীফ তখনো এসে পৌঁছাননি। বললাম, 'একি অবস্থা তোর?'

'আর কইয়ো না গুরু! আমার সর্বনাশ হইছে! কাউরে না জিগাইয়া বিয়া কইরা পড়ছি ফান্দে! বাঁচনের কোনো পথ নাই!'

বললাম, 'তুই ফ্যানের নিচে বসে আগে রেস্ট নে। তারপর আস্তে ধীরে বল আসলে কি ঘটেছে!'

নিলয় বসে না। বলে, 'আমার আর চাকরি করা হবে না গুরু! পূর্ণারে বিয়া কইরা আটদিন জেল খাইট্যা বাইর হইয়া আইলাম!'

নিলয়ের কাঁধে চাপ দিয়ে ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলি, 'বিয়ে করলে জেল খাটতে হবে কেন?'

'বিয়া কইরা আমরা একটা ঘর ভাড়া নিয়া নতুন সংসার পাতছিলাম! পুলিশ গিয়া আমাগরে ধরলো মশারির নিচে। পূর্ণার বাপে নাকি কিডন্যাপ কেস করছে। থানার ওসিরে কইলাম যে, আমরা দুইজনেই অ্যাডাল্ট। কোর্টে বিয়া করছি! সঙ্গে কাগজ-পত্রও আছে। ওসি হালা কইলো কোর্টের ব্যাপার

কোর্টেই শেষ করলে ভালো হবে। কোর্টের থাইকা পরদিন আমারে চালান কইরা দিলো জেলে!'

'পূর্ণা এখন কোথায়?'

'পুলিশ তারে তার বাপের হেফাজতে দিয়া দিছে!'

'কোর্টে এসে বললেই পারতো যে, তার মতে বিয়ে হয়েছে!'

'মনে হয় ওরে আটকাইছে! গুরু, তুমি একটা কিছু কর! আমার বউ আইনা দেও। তারে নিয়া গ্রামে চইলা যাবো!'

ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন জানি গোলমেলে মনে হচ্ছিলো। তবুও বললাম, 'তুই যাকে বউ বলছিস, সে কোর্টে কি বিয়ের কথা স্বীকার করবে?'

'অবশ্যই করবো। আমি তারে খুব ভালো কইরাই জানি!'

'সে কোথায় আছে কিছু জানিস?'

'না।'

'কোথায় থাকতে পারে বলে মনে করিস?'

'ওগো আত্মীয়-স্বজন ম্যালা! কোই যে পাঠাইছে অনুমান করতে পারি না!'

'বাপের বাড়িও থাকতে পারে!'

'না। সেইখানে থাকবার সম্ভাবনা নাই!'

তাহলে কোথায় থাকতে পারে? আমিও ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছিনা।

নিলয়কে বললাম, 'তুই চীফের সঙ্গে দেখা করে বাসায় চলে যা। তোদের ঘরে কেউ ব্যাপারটা জানে?'

'আরে পাগল নাকি? এই কথা বাসায় বলা মানেই আমার সাড়ে-সর্বনাশ! শাখারীপট্টিতে ঘর ভাড়া নিছিলাম। ওইখানেই উঠছি। ঘরে যাওয়ার সুযুগ নাই!'

'তাহলে চীফের সাথে দেখা করে বাসায় চলে যা। আমি ভেবে দেখি কি করা যায়। ঠিকানা দিয়ে যা। সন্ধ্যায় তোর বাসায় আসছি। বুদ্ধি একটা পাওয়া যাবেই!'

নিলয় বললো, 'আমার মাথা কোনো কাজ করতাছে না গুরু। তুমি আইসো। যতীনে আমার কথা কইলেই নিয়া যাইবো। আমি এখন গেলাম। বসেরে আমার কথা কিছু কওনের দরকার নাই!'

নিলয় চীফের অপেক্ষায় থাকে না।

আমি ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারলাম না যে, নিলয়ের মাঝে কী এমন কমতি আছে যে, পূর্ণার বাবা তাকে যোগ্য মনে করছে না? নিলয় তো পুরোনো

ঢাকার বনেদী হিন্দু পরিবারের ছেলে। সেন বংশের নাম ডাক কে না জানে! একবার বলেছিলো যে, নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেন তার কেমন জানি কাকা হয়। সেই নিলয় সেনের সাঙ্গে এমন ব্যবহার? সেন পরিবার তো পূর্ণার বাবাকে তার ঢাকার সব সম্পত্তি সহ অন্তত সাত বার কিনতে পারবে। কিসের জোরে লোকটা নিলয়কে অমন খাটো করে দেখছে?

সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার সহ্য হবে না। হাতের কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে চীফের রুমে গিয়ে হাজির হলাম। আমার একটা দুর্নাম আছে যে, আমি কখনোই শিডিউল টাইমে কাজ শেষ করতে পারি না। তাই আমাকে দেখে তিনি খুবই অবাক হলেন। বললেন, 'কোনো সমস্যা?'

'সমস্যা না বস! কাজটা শেষ করলাম!'

আমার কথায় তার ব্যুৎপত্তি হলো না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সব কাজ শেষ?'

বললাম, 'আমি আমার মত চেক করেছি। আপনি একটু দেখে দিলে ফাইনাল আউটপুট দিতে পারি!'

'ঠিক আছে। রেখে যাও। আর শোনো, নিলয়ের ঘর-বাড়ি চেনো? আগে কখনো গিয়েছিলে?'

'কখনো যাইনি। তবে চিনতে পারবো!'

এমনিতে কোনো খবর পেয়েছো? জানতে পেরেছো কিছু?

ওতো ফোনটোন করেনি। সকালে একবার এসে বললো যে ওর খুবই বিপদ! দেরি না করেই আবার চলে গেল!'

ওর বাসায় যাও। গিয়ে জেনে এসো অবস্থা কি। এভাবে তো আর কাজ বন্ধ করে রাখতে পারি না!'

বললাম, 'এখনই যাবো?'

'পাঁচটার আগেই ফিরতে হবে! অন্তত সাড়ে চারটায় তোমাকে অফিসে দেখতে চাই!'

আমি আর দেরি না করে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি। যানজট পেরিয়ে কোনোরকমে গুলিস্তান পর্যন্ত এগাতে পারলাম। কিন্তু সামনে আর যাবার উপায় নেই। রিকশার পেছনে রিকশা লেগে এমনই অবস্থা হয়েছে যে, না হাঁটলে আর নিলয়ের কাছে হয়তো পৌঁছানো যাবে না আজ। শাঁখারি পট্টিতে ঢুকতেই বেলা বারোটা পেরিয়ে গেল।

আমাকে দেখে নিলয়ের কেঁদে ফেলবার অবস্থা। বললাম গাধার মত কাজ না করে বল, তোকে হেল্প করতে পারে পূর্ণা ছাড়া এমন কেউ আছে কি না!'

নিলয় বললো, 'ওর দুর সম্পর্কের এক পিসি আছেন।'

'পিসি থাকেন কোথায়?'

নিলয় চোখ পিটপিট করে বললো, 'মাহুতটুলি।'

'তোদের ব্যাপারটা জানেন?'

'মোটামুটি!'

'তোরা দু'জনেই যেহেতু অ্যাডাল্ট তোদের বিয়ে নষ্ট করতে পারে না কেউ! তুই একজন ভালো উকিলের সঙ্গে কথা বলে দেখ। সে-ই তোকে এ মুহূর্তে সবচে ভালো বুদ্ধি দিতে পারে। আর এক্ষুনি চল তোর সেই পিসির বাড়ি! তাঁকেও ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে!'

নিলয় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। বললাম চিফ বলে দিয়েছেন যে, আমি যেন সাড়ে চারটায় অফিসে থাকি। আর তোর ব্যাপারটা দু'একদিনের মধ্যে ফয়সালা না হলে বরং চাকরিটা ছেড়েই দিস। চিফকে বানিয়ে বানিয়ে একটা কিছু বলে দিন তিনেক ম্যানেজ করা যাবে!'

নিলয় রেগে বললো, 'ধ্যাত্তেরি চাকরি! এখন চাকরি দিয়ে করবো কি আমি? এমন চাকরি না করলেও আমার চলবে!'

'তাহলে চল তোদের পিসির বাড়িতে যাই!'

পিসি সেকেলে মানুষ। অচেনা লোকের সামনে পারতঃপক্ষে যান না। নিলয় বললো, 'আমার বন্ধু। এক সঙ্গে চাকরি করি। ও আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়!'

'কি পরামর্শ করবে?'

'পূর্ণা এখন কোনখানে আছে এইটা আগে জানা দরকার!'

পিসি বললেন, 'সকালের দিকে শংকর আসছিলো। বললো, পূর্ণারে কয়দিন রাখতে পারবো কিনা। বললাম পারবো না কেন? তখন পূর্ণার মামা শিবু কইলো নিলয় এখানে আসবার সম্ভাবনা আছে কিনা। আমি ত অত প্যাঁচ বুঝি না বাবা, কইলাম আসতে পারে! তখন শিবু কইলো তাইলে টাঙ্গাইল রাইখ্যা আসি!'

বললাম, 'টাঙ্গাইল কোথায় থাকতে পারে আপনি জানেন কিছু? অনুমান করতে পারেন?'

'শিবুর শশুর বাড়ি। জামতলা। শশুরের নাম বাদল ঘোষ।'

বললাম, 'পিসি আমরা এখন যাই! এ কথা আর কউকে বলবার দরকার নেই! পূর্ণাকে আমরা বের করবোই!'

পিসি বললেন, 'শংকইরার কয়টা কাঁচা পয়সা হইছে! এখন মানুষ চোখে দেখে না!'

আমরা মাহুতটুলি আর দেরি করলাম না। নিলয়ের জামিন করিয়েছে যে উকিল, নরেশ গুপ্ত। তাকে খুঁজে বের করবার জন্য আমরা কোর্টে গেলাম। দেখা হলো না। সেখান থেকে তার বাসায় গিয়ে ধরলাম। বললাম, 'আপনি থাকতে নিলয় জেলে যায়? আপনি আরেকটা কেস করে সঙ্গে পুলিশ নিয়ে গিয়ে তার বউকে উদ্ধার করেন। পূর্ণাকে নাকি তার মামার শ্বশুর বাড়ি টাঙ্গাইলের জামতলায় বাদল ঘোষের বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে পারে!'

নরেশ গুপ্ত বললেন, 'ঠিক আছে! আমি দেখছি ব্যাপারটা। নিলয় সন্ধ্যার দিকে একবার এসো। কিছু কাগজে তোমার সাইন লাগবে। আর ঘটনাটাও আবার ভালো করে শুনবো! কেমন?'

নিলয়কে বললাম, 'এখন তোর একার মাথা ব্যথা! আমি অফিসে ফিরে যাচ্ছি! তোর কথা কি বলবো?'

'গুরু! তোমরা নতুন লোক নিয়া নিও। আমারে দিয়া আর চাকরি-বাকরি হইবো না!'

তাহলে প্রতিদিন একবার করে ফোনে আমাকে রিপোর্ট করিস। নইলে দুচিন্তায় থাকবো।

নিলয় বললো, 'ফোনে তোমারে সবই জানাবো। তুমি যাও। সাড়ে চারটায় পৌঁছতে পারবা কিনা জানি না! তবে বেবিটেক্সিতে গেলে কিছুটা তাড়াতাড়ি হইবো!'

নিলয়কে উকিল নরেশ গুপ্তর বাসায় রেখেই বেরিয়ে পড়লাম। আমার মাথায় তখন কেবল একটাই চিন্তা যে, সাড়ে চারটার সময় আমাকে অফিসে থাকতে হবে!

রাস্তার ভিড়-ভাট্টা কাটিয়ে অফিসে ফিরতে ফিরতে পৌনে পাঁচটা বেজে গেছে। চিফের কথা ভেবে আমার সারা শরীর থেকে ঘাম ছুটলো। বিশেষ করে আমার মাথা থেকে ঘাম ঝরতে আরম্ভ করলে আর কিছুতেই স্বস্তি পাই না!

চিফ আমার চেয়ারেই বসে ছিলেন। বললাম, 'বস আমার একটু দেরি হয়ে গেল!'

'ও আমি জানি!'

মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন তিনি।

বললাম, 'কিছু খুঁজছেন?'

'কাল যে ঢাকার ম্যাপটা দিলাম, সেটা কোন ফোল্ডারে রেখেছো?'

'ডি ড্রাইভে। আপনার নামে একটা ফোল্ডার আছে।'

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন, 'ম্যাপটার একটা কালার প্রিন্ট নিয়ে রুমে এসো!'

চেয়ারে বসতেই আমার ভীষন ইচ্ছে হচ্ছিলো যে, হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থাকি। কিন্তু বসের কল্যাণে তো এখন সে সুযোগটা নেই! তাড়াতাড়ি ম্যাপটার একটা কালার প্রিন্ট নিয়ে চিফের রুমে গেলাম। আর মুহূর্তেই শরীরটা এসির ঠান্ডা বাতাসে জুড়িয়ে গেল।

চীফের কাজ-কর্মগুলোর মাঝে এই একটা দিক আমার ভালো লাগে না। স্বার্থপরের মত কেবল নিজের রুমেই এসি লাগিয়ে রেখেছেন। আমাদের জন্য কেবল সেই কোন আমলের পুরোনো ফ্যান বরাদ্দ করেছেন। যা মাথার ওপর ঘোরে ঠিকই কিন্তু বাতাস তেমন গায়ে লাগে না। অনেকবার ভেবেছি চাকরিটা পাল্টে ফেলবো। কিন্তু ভাবনাই সার। কোথাও আর খোঁজ নেয়া হয়ে ওঠে না।

ম্যাপটা হাতে নিয়ে তিনি একটা চেয়ারের দিকে হাত তুলে বললেন, 'বসো!'

চেয়ারটা একটু টেনে বসতেই বললেন, 'নিলয় কি চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছে?'

আমি এমন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারি ভাবিনি। তাই নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেললাম, 'ও তো তেমনিই বললো!'

'কি ঘটেছে?'

পুরো ঘটনা খুলে বলতেই তিনি বললেন, 'বেচারা খুবই বিপদে আছে দেখছি!'

তিনি ফোন তুলে কোনো একটা নাম্বারে ডায়াল করে বললেন, 'হ্যালো, আমজাদ? আমি চঞ্চল! হ্যাঁ। তোদের ওখানে জামতলা বলে কোনো গ্রামের বাদল ঘোষের বাড়িতে পূর্ণা নামের একটা মেয়েকে আটকে রেখেছে। মেয়েটা যদি নিলয় নামের কারো ওয়াইফ হয়, তাহলে তোর পক্ষে যদ্দুর করা সম্ভব সে প্রসেস করে তাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। পি-জ!'

ওপাশের আমজাদ নামের লোকটা কিছু বলতেই চিফ বললেন, 'অফিসেই আছি। তুই ফোন করলেই বেরোবো!'

আমার তো কিছুই বিশ্বাস হতে চাচ্ছিলো না। চিফ নিজেই কথা বললেন নিলয়ের ব্যাপারে?

আমার বিস্মিত চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'খুবই অবাক লাগছে?'

আমি উত্তরে কেবল মাথা দোলাই।

'আমজাদ আর আমি এক সঙ্গেই বড় হয়েছি। খুব ভালো বন্ধু! টাঙ্গাইল থানার ওসি। বলেছে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই রিপোর্ট করবে!'

বললাম, 'তাহলে কি ওরা পূর্ণাকে নিয়েই আসবে?'

'তাই তো বললো!'

তারপর তিনি আবার বললেন, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় মেয়েটা সত্যি কথা বলবে?'

'বলবে বলেই তো তাকে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে!'

'ঠিক আছে যাও! আমজাদ কি বলে সেটা আগে জানি। তারপর না হয় নিলয়কে খবর দেয়া যাবে!'

চিফের কথাটা শুনে আমার খুবই ভালো লাগলো। তাঁর গুরুগম্ভীর চেহারা দেখে কখনোই আমাদের মনে হয়নি যে, লোকটা আমাদের নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবে। কিন্তু এখন আমার ধারণাগুলো কি উইথড্র করে নেবো?

রুম থেকে বেরোবার আগে বললাম, 'আজ কোনো নতুন কাজ আছে?'

'না। দু'দিন রিল্যাক্স করো! ইচ্ছে হলে ছুটিও কাটাতে পারো!'

বললাম, 'এখন আর ছুটি নেবো না বস! নিলয়য়ের ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় শেষ হলেই হয়!'

'তুমি থেকো! দরকার হতে পারে!'

বললাম, 'আছি!'

চিফের রুম থেকে বেরোতেই শান্তা বললো, 'মমিন ভাই, নিলয়ের প্রবে-মটা কি?'

বললাম, 'পেট খারাপ!'

আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলো না মেয়েটা। বললো, ওর দু'দিন পরপরই পেট খারাপ হয়! ভালো ডাক্তার দেখাতে পারে না?'

'এ দেশে ভালো ডাক্তার আছে নাকি? আর যারা ভালো ডাক্তার তাদের কাছে রোগীরা আগেই লাইন দিয়ে বসে থাকে। আমাদের মত এমন ছুটকা চাকরের দল লাইন দিয়ে বসে থাকবার অত সময় পাবে কোথায়?'

হাতে কোনো কাজ না থাকলে আমার সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। কখন যে ওসি আমজাদ সাহেব বসকে ফোন করবেন কে জানে? নিলয়কে কি পূর্ণা সত্যিই ভালোবাসে? অবশ্য কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা আজই সেটার পরীক্ষা হয়ে যাবে!

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার দিকে আমজাদ সাহেব ফোন করে জানালেন যে, পূর্ণাকে নিয়ে তারা এক্ষুনি আসছেন। পৌঁছতে দু'আড়াই ঘন্টা লাগবে। ফাঁকা অফিসে আমরা মোটে তিনটে মানুষ। আমি, বস আর পিয়ন আলাউদ্দিন।

চিফ বললেন, 'নিলয়কে খবর দাও!'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন রিনরিন করে উঠলো। বেচারা নিলয়! এমন প্রেমই করলি যে, প্রেমের জন্য কারাবাস! সন্ধ্যার পর নিলয় উকিলের বাসায় যাবার কথা। আসবার সময় উকিলের একটা কার্ড নিয়ে এসেছিলাম। পকেট থেকে কার্ডটা বের করে উকিলের ফোন নাম্বারে ডায়াল করলাম। একটা পুরুষ কণ্ঠ ফোন ধরে বললো, 'গুপ্ত বলছি!'

বললাম, 'নিলয় আসার কথা ছিলো। সেকি এসেছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছে!'

'তাকে কি একবার দেয়া যাবে? আমি মোমিন!'

নিলয় ফোন ধরতেই বললাম, 'এক্ষুনি চলে আয় অফিসে! বস বসে আছেন। টাঙ্গাইল পুলিশ তোর বউ নিয়ে আসছে!'

'কি কইতাছ গুরু?'

নিলয়ের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর বাজে।

বললাম, 'বসকে বলেছিলাম তোর কথা। টাঙ্গাইল পুলিশকে উনিই সব বলেছেন। তুই আয়!'

'এক্ষুনি আইতাছি!' বলে, খটাস করে ফোন রেখে দেয় নিলয়।

রাত বেড়ে যাচ্ছে বলে আমার চিন্তা হচ্ছিলো যে, নিলয়ের ঝামেলা শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে? বাসায় ফিরবো কখন? রাস্তা ঘাটের যে অবস্থা, কোথায় হাইজ্যাকার খুনি বদমাশ ওৎ পেতে থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই।

নিলয় আসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন কনস্টেবল সহ পূর্ণাকে নিয়ে হাজির হলেন ওসি আমজাদ।

সে এক দৃশ্য বটে! আমার জীবনের একটা বিশাল অভিজ্ঞতা! পূর্ণাকে দেখে বসের সামনেই জড়িয়ে ধরলো নিলয়। আর সে সাথে জুড়ে দিলো হাউমাউ কান্না! নিলয় কাঁদে। কাঁদে পূর্ণাও।

চিফ ওদের দু'জনের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আরে এ সময় কেউ কাঁদে নাকি? এখন তো আনন্দ করার সময়! পার্টি হবে। ভালো খানাপিনা হবে! একটা ছোটোখাট পিকনিকের মত হবে!

চিফের নতুন নতুন চেহারা দেখে ক্রমশঃ হতবাক হচ্ছিলাম।

ওসি আমজাদ বললেন, 'ঘটনা তোর চাইতেও ইন্টারেস্টিং!'

চিফ বললেন, 'আমার তো জেল খাটতে হয়নি। বেচারা আটটা দিন জেলও খেটেছে!'

'আরে গিয়ে দেখি শালারা মেয়েটাকে গোয়াল ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

'তুই ওদের কিছু বললি না?'

'ক্রিমিন্যাল দু'টোকে লকআপ করে এসেছি। গিয়ে সাইজ করবো!'

নিলয় আর পূর্ণাকে নিয়ে বের হতে রাত বারটা বেজে গেল।

ট্যাক্সিতে বসে নিলয় বললো, 'গুরু আমার সংসারটা দেখবা চলো! একটা বিছানা আর দুইটা পাতিল দিয়া সংসার পাতছিলাম। রাত্রটা আমাগ লগে কাটাইবা। সকালে এক লগে অফিসে চইলা আসমু!'

'তোর বউ পাহারা দেবে কে?'

'সেই ব্যবস্থা হইবো!'

'কি ভাবে?'

'মায়েরে তুমি যেমনে হউক বুঝাইবা!'

'এটা কি করে সম্ভব?'

'তোমারে না আমি গুরু মানছি!'

নিলয় আমার হাতটা চেপে ধরলো।

পূর্ণার দিকে তাকাতেই দেখলাম ও কেমন চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে। আর তখনই তাকে আমি চিনতে পারলাম। নিলয় যেদিন বলতো, 'তুমি যাওগা গুরু! আমার বাইর হইতে দেরি হইবো!' আর ঠিক সেদিনই বাস-স্ট্যান্ডে ওকে দেখতাম কেমন উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। তার মানে এ মেয়ে তখন নিলয়ের জন্যই দাঁড়িয়ে থাকতো?

পূর্ণার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বাসস্ট্যান্ডে এভাবে কাকের মত ওদাঁড়িয়ে না থেকে, আমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করলেই আর এই হেনস্তাটা হতে হতো না!'

আমার কথায় পূর্ণার মাঝে কোনো রকম জড়তা দেখা গেল না। সাবলীল ভাবেই বললো, 'আমিও তো অনেকবার দেখেছি! কিন্তু তখন কি আমি জানতাম আপনি কে? তা ছাড়া আপনার সঙ্গে প্রথম দিকেই পরিচয় করিয়ে দেয়াটা কি ওর উচিত ছিলো না?'

নিলয়ের দিকে তাকাতেই সে বললো, 'ভুল করছি গুরু! আর ভুলের খেসারতও দিছি। দুইজনে মিলাই দিছি!'

শাখারীপট্টি তাদের নতুন ঘরের কাছে নামিয়ে দিয়ে নিলয়কে বললাম, 'কাল অফিসে যাবার দরকার নেই! বসকে বুঝিয়ে বলবো। আর বিকেলের দিকে আসবো তোর মাকে পটাতে!'

নিলয় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। পূর্ণা বললো, 'আমরা আপনার জন্য ওয়েট করবো!'

নিলয়কে কথা দিয়ে আমি খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। আমি যে তার মাকে পটাতে পারবো সেটা তো সে বিশ্বাস করে বসে আছে! কিন্তু আমি যে কী ভাবে কাজটা করবো, তা ভাবতে গেলেই মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছিলো! আমার নিজের উপরই খুব রাগ হচ্ছিলো। কেন যে নিলয়কে কথাটা বলতে গেলাম! নিজের ঘাড়ে নিজেই সমস্যা ডেকে এনেছি!

নিলয়ের মায়ের কাছে কথাটা কিভাবে পাড়বো সেটা ভাবতে ভাবতেই ঘামছিলাম। হঠাৎ তিনি চা-নাস্তা নিয়ে এসে পাশে বসে বললেন, 'বাবা তুমি এত্ত ঘামছো কেন? ফ্যানের স্পিড তো ফুল দেয়া আছে!'

'আদাব' জানিয়ে বলাম, 'আমার কিছুটা হাইপ্রেশার আছে। তা ছাড়া নিলয়কে নিয়ে একটু চিন্তায় আছি!'

তিনি কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'নিলয় কি করেছে?'

বললাম, 'ও তো বেশ ক'দিন ধরে অফিস করছে না! এ নিয়ে বস আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে!'

তিনি কেমন সন্দেহের চোখে আমাকে দেখে বললেন, 'ও তো যশোরে গেছে! ওর ছোট পিসির বাড়ি! তুমি কিছু জানো না?'

‘জানবো কি করে? ও তো ছুটি-টুটি নেয়নি! বস বললেন ওদের বাড়ি গিয়ে দেখে এসো ব্যাপারটা কি?’

‘দু’দিন আগেও তো মনে হয় ছেলেটা ফোন করেছিলো। বললো, ভালো আছে। আরো কটা দিন থেকে আসবে!’

বললাম, ‘আপনি দু’একবার ফোন করেছিলেন?’

‘ওই তো করে। আমি আর করবো কখন? এখন অবশ্য ট্রাই করেছিলাম। লাইন পাইনি। এ্যানগেজড টোন দিচ্ছে। ওর বাবাকে ফোন করেছি আসবার জন্য। আমার কেন জানি ভয় করছে বাবা। তুমি কিছু গোপন কোরো না!’

‘গোপন করবার কি আছে? পূর্ণা নামের কাউকে চেনেন?’

‘না তো! পূর্ণা কে?’

‘এ ক’দিন ও মেয়েটাও অফিসে ফোন করছে না!’

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে তিনি বললেন, ‘একটা মেয়ে অবশ্য ওকে ফোন করতো। নাম টাম বলেনি কখনো। ভেবেছি ওরই কোনো কলিগ বা বন্ধু-টন্ধু হবে! তোমার কথা অনুযায়ী প্রায় একই সময় ধরে মেয়েটার ফোন পাই না। তার মানে...।’

কথা শেষ না করে তিনি আবার আমার মুখেরওকে তাকিয়ে রইলেন। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিলো। বললাম, ‘মাসীমা কিছু বলতে চাচ্ছেন?’

তিনি বললেন, ‘মেয়েটা আর নিলয় একটা কিছু করেছে। এমন কিছুই তো তুমি বলতে চাচ্ছো! তাই না?’

আমি চুপ করে থাকলাম। ভাবছিলাম এ মুহূর্তে কী বলতে পারি!

আমার ভাবনার মাঝ পথেই নিলয়ের বাবা অভিজিৎ সেন ঘরে ঢুকলেন। তাকে কেমন উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিলো। আমি দাঁড়িয়ে তাকে আদাব জানালাম। ব্যাপারটা নিয়ে তিনিও ইতোমধ্যে অনেক কিছুই ভেবে বসে আছেন। আর সেগুলোর সবই যে অশুভ কিছু, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

তিনি বসে আমাকে বসতে বলে, বললেন, ‘তুমি তো ওর কলিগ! সারাদিন বলতে গেলে ও তোমাদের সাথেই থাকে। তোমরা এমন কিছু জানতে পারোনি বা কিছু আঁচ করতে পারোনি?’

‘আমরা জানি ও বেশ চাপা! নিজের ব্যাপারে খুব সহজেই কিছু বলতে চায় না। আমরাও ওকে কিছু বলতে কখনোই পিড়াপিড়ি করিনি!’

মাসীমা ঘুরে তাঁর স্বামীর মুখোমুখি হয়ে বললেন, ‘তোমাকে বলেছিলাম না একটা মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের সম্পর্ক আছে?’

‘হ্যাঁ। তো কি করেছে মেয়েটা?’

‘মেয়েটা তোমার ছেলের অফিসেও ফোন করতো। ও যদ্দিন হলো যশোর যাবে বলেছিলো তদ্দিন ধরে মেয়েটাও নাকি অফিসে ফোন করছে না!’

অভিজিৎ সেন চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। মনে হলো আমার ভেতরকার গোপন ব্যাপারগুলোর দিকেও চোখ ফেলেছেন। বললেন, ‘ও অফিস থেকে ছুটি নেয়নি?’

‘ও তো আমাদের কিছুই বলেনি!’

মাসীমা আবার উঠলেন। নিলয়ের বাবা বললেন, ‘কোথায় যাচ্ছো?’

‘আশাকে একটা ফোন করে দেখি, ছেলেটা সত্যিই ওখানে আছে কিনা!’

অভিজিৎ সেন বললেন, ‘আমিও কি আসবো?’

‘না। তুমি বসো। ছেলেটা এলো। ও কি একা বসে থাকবে নাকি?’

‘আচ্ছা বসছি আমি!’

অভিজিৎ সেন আবার বসতেই আমার হঠাৎ ঘাম ঝরতে আরম্ভ করেছে।

হাঠাৎ করেই তিনি বললেন, ‘আমার ছেলে কোনো একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে। এটাই তোমরা সন্দেহ করছো?’

‘তেমন সন্দেহ করছি না। কিন্তু ও যে যশোর যাবে, তা আমাদের বলতে পারতো। অফিস থেকে ছুটি নিতে পারতো!’

একটু পরেই মাসীমা চোখে আঁচল চাপতে চাপতে এলেন।

অভিজিৎ সেন উঠে বললেন, ‘তুমি কাঁদছো কেন?’

মাসীমা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে বললেন, ‘ছেলেটা আশার ওখানে যায়নি!’

তারপর চোখে আবার আঁচল চেপে তিনি বলতে লাগলেন, ‘এখন কি হবে গো! আমার ছেলেটা কোথায় আছে, কেমন আছে? কোনো বিপদ-আপদ হলো নাকি গো? এই বলে বলে, তিনি বিলাপ করতে লাগলেন।

অভিজিৎ সেন কিছু বুঝতে পারলেন কিনা কে জানে। আমার দিকে আবার সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমাদের ধারণা নিলয় পালিয়েছে? পালিয়ে ওই মেয়েটাকে বিয়ে করেছে?’

আমি কিছু বলি না।

তিনি আবার বলতে লাগলেন, ‘ওকে তো কখনো বলিনি যে ওর পছন্দ মত বিয়ে করতে দেবো না। এমন কি ওকে কখনো বিয়ের জন্য জোরও করিনি। কিন্তু ও এমনটা কেন করবে? আমার তো মাথায় ঢুকছে না কিছু!’

আমি আমার অ্যাসাইনমেন্টের রেজাল্ট পেয়ে গেছি। এখন শুধু অপেক্ষা। কখন গিয়ে নিলয়কে ব্যাপারটা জানাবো।

'ও কি কোনো সুইপারের মেয়েকে পছন্দ করে? তাকে বিয়ে করেছে? তাতে কি? এ জন্য ঘরের কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে থাকবে এ কেমন কথা? প্রত্যেকটা পরিবারেই কোনো না কোনো একটা অস্বাভাবিক ঘটনা থাকে। তা বলে সমস্যার মোকাবেলা না করে, সমাধান বের করবার চেষ্টা না করে পালিয়ে থাকতে হবে? ওর সেজো কাকা তো দু'সন্তান সহ এক মুসলমান বিধবাকে বিয়ে করে, এমনকি নিজে মুসলমান হয়ে অনেকদিন আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগই রাখেনি। পরে আস্তে ধীরে সব ঠিক হয়ে গেছে। ওর ব্যাপারটাও এক সময় ঠিক হয়ে যেতো!'

বলালাম, 'আঙ্কেল, ওর অভাবে আমাদের অফিসের অনেক কাজ পেন্ডিং হয়ে আছে! বলছিলাম, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়? এক সময় ওর চোখে পড়তে পারে!'

মাসীমা কান্না ভুলে বললেন, 'ঠিক ঠিক! এ না হলে ওর মনে কোনো ভয় কাজ করতে পারে। বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়লে নির্ভয়ে বাড়ি চলে আসতে পারবে!'

'ও কোন পেপারটা পড়তে পছন্দ করে জানো?'

চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে প্রশ্ন পাঠিয়ে দিলেন অভিজিৎ সেন।

বললাম, 'বিজ্ঞাপন বেশি থাকে বলে ও ইত্তেফাকই পছন্দ করতো!'

'আচ্ছা দেখি, কি করা যায়! ইয়াং পোলাপান, মাথার স্ক্রু আর জয়েন্টগুলো এখনো ঠিক হয়ে বসেনি! তোমার সাথে যদি কখনো ফোনে যোগাযোগ করে তা হলে আমাদের জানিও! আর ওকেও বলে দিও, ভয় নেই!'

বললাম, 'জানাবো!'

আমি উঠলে মাসীমা আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফোন করলে বলবে, বিয়েও যদি করে থাকে, বউ নিয়েই আসতে বলবে! বলবে আমরা সব কিছু মেনে নেবো!'

মাসীমার কথা শুনে আমার মনে হলো, ওঁরা দু'জনেই বিচক্ষণ। কত সহজেই মেনে নিলেন। বাবা-মা গোঁয়ার হতে নেই। সন্তানদের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে সেটার ফল খুব একটা শুভ হয় না। সহানুভূতি দিয়ে না বুঝিয়ে এমন চাপাচাপির কারণে কত যৌবন-দীপ্ত প্রাণ অকালে হারিয়ে যাচ্ছে এ পৃথিবী থেকে।

নিলয় আর পূর্ণা গত রাতে যেখানে নেমেছিলো দিনের আলোতে আজ সে পথটা খুঁজেই পেলাম না। ঠিক করতে পারলাম না কোন বাড়িটাতে ওরা উঠেছে। শেষে শ্রান্ত আর ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

ঘরে ঢুকতেই বউ জিজ্ঞেস করলো, 'অফিসে ছিলে না। কোথাও গিয়েছিলে? ফোন করে পেলাম না!'

বললাম, 'গিয়েছিলাম পুরোনো ঢাকায়। এক কলিগের বাড়ি।'

'আম্মা এসেছিলো! বিকেল পর্যন্ত বসে থেকে গেছে!'

'নতুন করে আবার কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি?'

'সমস্যা না হলে যে ওরা আসেন না, তা তো বুঝতেই পারছো!'

'সমস্যাটা কি?' বলে, আমি বাইরের পোশাক ছেড়ে লুঙ্গি পড়ে নিলাম। কিন্তু বউ কিছু বললো না। মুখটা কেমন থমথমে হয়ে আছে। বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে যখন বসেছি, তখনই সে চা নিয়ে এলো। মনেমনে এক কাপ চা পেতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছিলো। তাই চা পেয়ে মনটা খুবই ভালো আর উদার হয়ে গেল। মনেমনে ঠিক করলাম, বউ যদি কোনো উদ্ভট কথাও বলে বসে তবুও তা মানতে চেষ্টা করবো। আর বাপের বাড়ি যেতে চাইলেও না করবো না। কারণ তার যখন কোনো ব্যাপারে আমার মতামতের প্রয়োজন পড়ে তাহলে স্বেচ্ছায় এক কাপ চা বানিয়ে আমার হাতে দিয়ে পাশে এসে বসে।

ছেলেটা দুপুরে হয়তো ঘুমিয়েছিলো। এখনো ঘুমোচ্ছে।

আমি বললাম, 'আমাকে এখন কি করতে হবে?'

রায়না আমার দিকে চোখ তুলে আবার নামিয়ে নেয়। বলে, 'কিছুই করতে হবে না!'

'তাহলে?'

'আম্মা ভাইয়ার বাসায় থাকবে। কাল-পরশু আমাকে বাসে তুলে দিও। আম্মার সাথে বাড়ি যাবো!'

'ফিরবে কবে?'

সে হাসলো। বললো, 'সপ্তাহ খানেক একা থাকতে পারবে না?'

'পারবো না কেন? তুমি যদি আর ফিরে না আসো আমাকে কি থাকতে হবে না?'

রায়না রেগে গেল। বললো, 'কথাটাকে এভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বললেও তো পারতে! পারতে না?'

'পারলাম আর কোথায়?'

আমাদের কথার শব্দে ছেলেটার ঘুম ভেঙে গেল। আর চোখ খুলে আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলো, 'বাবা!'

বললাম, 'ঘুমটা ভেঙে গেল?'

'হ্যাঁ, বাবা!'

ছেলেটা আমার কাছে এগিয়ে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি কি জানো আমরা নানুর বাড়ি যাবো?'

'কি করে জানবো বাবা? তুমি তো আমাকে কিছুই বলোনি!'

'মা ফোন করেছিলো তোমাদের অপিসে। তুমি তো ছিলে না! কি ভাবে তোমাকে বলবো?'

ছেলে তার মায়ের পক্ষে মঞ্চে উঠেছে। তার সাথে আলাপেই সব ফাইনাল হবে এখন।

বললাম, 'আমি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম।'

'তুমি আমাদের সাথে যাবে না?'

'পানির ওপর দিয়ে কোথাও যেতে আমার ভালো লাগে না বাবা!'

'তুমি ভয় পাও? আমি তো ভয় পাই না!'

'তোমার যে অনেক সাহস! তাই ভয় পাও না!'

'আমরা নানুর সাথে যাবো। তুমি একাএকা থাকবে। একটুও কান্না করবে না কিন্তু!'

'তোমরা বেশিদিন থাকলে আমার খারাপ লাগবে যে!'

'তাহলে আমাদের কাছে চলে আসবে!'

ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার বদমাশ মন কিছুটা উৎফুল- হয়ে উঠলো। আবার কয়েকদিনের জন্য আমি ফ্রি। এবার দীপাকে নিয়ে দুরে কোথাও চলে যাবো। কিন্তু তার আগে ঠিক ঠিক জানতে হবে যে, ওরা কদিনের জন্য যাচ্ছে! বললাম, 'বাবা তিনদিন কষ্ট করে থাকতে পারবো! এর বেশি পারবো না!'

রান্না ঘর থেকে ফিরে এসে রায়না বললো, 'এ পর্যন্ত একটা সপ্তাহ কোনোদিন বাপের বাড়ি থাকতে দিয়েছো? বিয়ের পর থেকেই তো তোমাদের ধোপা-বিবুর্চির কাজ করে মরছি! আমার কি ইচ্ছে হয় না একটু ফ্রি হতে? তুমি সপ্তাহে একদিন ছুটি পাও। আমার কি ছুটির প্রয়োজন নেই?'

বললাম, 'আছে! তা হলে একবারে পনের দিনের ছুটি নাও! কিন্তু তুমিই তো চলে আসো দু'দিন পর!'

'না এসে উপায় কি? আমি না থাকলে তো ঘরটাকে একটা আস্তাকুড় বানিয়ে রাখো! আর এসব পরিষ্কার করতেই আমার লাগে তিনদিন!'

বললাম, 'দেখ, তোমার ওপরই আমি ষোলোআনা নির্ভরশীল। তোমাকে ছাড়া আমি যে একটা দিনও চলতে পারি না!'

রায়নার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হয়তো মনে মনে খুশিও হয়। হাসি লুকিয়ে বলে, 'এবার পারতে হবে! কাল বাসে তুলে দিয়ে অফিসে যাবে! তারপর ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় গিয়ে আমাদের নিয়ে আসবে! ঘরদোর নোঙরা করবে না! কাপড়-চোপড় এদিক সেদিক ফেলে না রেখে সব কিছু গুছিয়ে রাখবে!'

মনে মনে বললাম তাহলেই হয়েছে! ঘরে আর থাকা হবে না আমার। এই এক সপ্তাহের জন্য দরকার হলে কোনো হোটেলে গিয়েই থাকবো। নিজে রান্না করে খেতে আমার একদম ভালো লাগে না! বউয়ের চূড়ান্ত মতামত পেতেই আমার নাচতে ইচ্ছে হলো। আমার সুযোগ-সন্ধানী মন সাথে সাথেই প-্যান করতে বসে যায়।

কিন্তু দীপাকে কি পাওয়া যাবে? হয়তো দেশে চলে গেছে। আর মিশনের কাজে যদি কোথাও গিয়ে থাকে তাহলে পাওয়ার কোনো আশাই নেই!

নিলয় দু'দিন পর অফিসে এলো। বললাম, 'যোগাযোগ করলি না যে?'

'সুযোগ কোই? বাপ-মায়ের পা টিপতেই তো দুইজনের সময় যায়!'

'তাহলে তোদের সমস্যা মিটেছে?'

'গুরুর আশীর্বাদ!'

তারপর কণ্ঠ নামিয়ে বললো, 'তোমার খুব নাম-কাম হইছে গুরু!'

আমার খুব মজা লাগছিলো। বললাম, 'কেমন?'

'বাপ-মা দুইজনেই কইতাছিলো, তোমার বুদ্ধিতেই নাকি কাগজে আমার ছবি ছাপাইছে! পূর্ণাও কইতাছিলো যে, তোমার কোনো তুলনাই হয় না! বহুত দিল দরিয়া মানুষ!'

আমার মনে পড়লো নিলয়ের বাবা অভিজিৎ সেনের কথাগুলো। সে তুলনায় এখনকার বেশির ভাগ বাবা-মায়েরা তেমন উদার নন। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাবা-মায়েদের উদারতা বলতে গেলে হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন তাঁদের বেশিরভাগই চান নিজের পছন্দ মত ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিতে। এতে করে ছেলে-মেয়েরা সুখি হোক বা না হোক তাঁদের কিছু যায় আসে না।

মেয়ের বাবা চান মিলিওনিয়ার জামাই আর ছেলের বাবা চান মিলিওনিয়ার শশুরের একমাত্র কণ্যা। এমন করে আমাদের সমাজে বিয়ের হার কমে যাচ্ছে। উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের সময় মত বিয়ে হচ্ছে না।

বললাম, 'আসলে তোর বাবার মত লায়ন হার্টেড মানুষ বলতে গেলে আমার এই জীবনে দেখিনি। তোর বাবা আমাকে বলেছিলেন যে, তুই একটা সুইপারের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলেও আপত্তি করতেন না। কিংবা ও ধরনের কোনো একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেললেও তোদের মেনে নিতেন। তাঁর আপত্তি কেবল একটা জায়গায়। আর তা হলো পালিয়ে বিয়ে করা বা বিয়ে করে আত্মগোপন করে থাকা! কথায় যা বুঝলাম এই দু'টো ব্যাপারকে তিনি খুবই ঘৃণা করেন!'

'এইটা তো আমি জানতাম!'

'জেনেও কেন ভুলটা করলি?'

'ভাবছিলাম পুর্ণার দাদা চাড়াল, মানে, জাউলা আছিলো। সেন বংশ আর কৈবর্ত বংশের কোনো মিলের কথা আমার জানা নাই। তাই বিশ্বাসটা তেমন আছিলো না! এখন বুঝতাছি যে, কামটা ভালো করি নাই! বিরাট ভুল হইয়া গেছে!'

বললাম, 'আর এ জন্য তো মাশুলও গুণেছিস চড়া। আটটা দিন জেল! তবে একটা জিনিস বুঝতে চেষ্টা করিস আর তা হলো, বাপ-মাকে কোনো ভাবে রাজি করানোর মত সহজ কাজ আর পৃথিবীতে নেই!'

নিলয় বললো, 'গুরু! বাবা আইজকা খুব সকাল সকাল লোক পাঠাইয়া আমার সংসার উঠাইয়া নিয়া আইছে! তবে, দুইজনেই পুর্ণারে খুবই পছন্দ করছেন! এখন যদি আমারে দুইজনে মিলা দুই বেলা পাছায় লাথি মারেন তাইলেও মন খারাপ করমু না!'

নিলয়ের চোখমুখই বলছিলো যে, তার এখন সত্যিকার অর্থেই সুখের দিন। বললাম, 'বেশি সুখে পড়ে আবার আমার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দিস না! তোর চাঁড়ালনিকেও কথাটা জানিয়ে রাখিস!'

'তা আর কইতে হইবো না। কিন্তু আমার সন্দেহ কোনো এক সময় তুমিই মায়েরে সব বইলা দিতে পার!'

'তা হয়তো পারি। কিন্তু তোদের কাছ থেকে জানতে পারলে মনে কষ্ট পাবেন। আর বাপ-মাকে কষ্ট দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ সুখ পায়নি! কোনোদিন

ভুলেও তাদের ঠকাবি না! কু-কাজ যা করবার তা তো করেই ফেলেছিস। আর না!'

'গুরু! তোমার হাত আমার মাথায়। এই ভুল আর হইবো না! কিন্তু মা তোমারে আইজকা যে কইরাই হোক সঙ্গে নিয়া যাইতে কইছে!'

নিলয়ের কথা শুনে আমার মনের ভেতরটা কেমন গুরগুর করে উঠলো। বললাম, 'কেন যেতে বলেছেন?'

'তা তো আমারে বলেন নাই!'

সারাদিন ভাবলাম নিলয়ের মায়ের ব্যাপারটা নিয়ে। উনি কেন আমাকে যেতে বললেন? ভালো-মন্দ সবরকম ভাবনাই একবার করে উঁকি দিয়ে গেল মনের জানালায়। কিন্তু কোনো সমাধানে পোঁছুতে পারলাম না। কাজে অমনোযোগীতার জন্য চিফের ধমক খেলাম দু'বার। কিন্তু চিন্তা আর ভয়ের ভূতটা নামলো না মাথা থেকে।

অফিস ছুটির পর বেশ ভয়ে ভয়েই গেলাম নিলয়দের বাড়িতে। মাসীমা আমাকে দেখে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই!'

বললাম, 'আমি কিছু জানতে চাইলে সেটা বলতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি থাকবে না!'

মাসীমা কিছু বললেন না দেখে আমি আবার বললাম, 'আমার দোষটা কি? কেন কথা বলবেন না?'

'আমার বিভীষণটা যে, ঘর ভাড়া করে বউকে নিয়ে সংসার পেতেছে তা জেনেও কেন বললে না?'

বললাম, 'মাসীমা, আপনি যেমন পরে জেনেছেন আমিও তেমন!'

'মিথ্যে বলবেনা বলে দিচ্ছি! বউকে যখন টাঙ্গাইল থেকে তোমাদের অফিসে নিয়ে এলো, তখন ওদের বাসায় পোঁছে দিয়েছিলো কে? তুমি সঙ্গে ছিলে না বলতে চাও?'

'না মাসীমা। আমি তো ওদের সঙ্গেই এসেছি। কিন্তু রাতের বেলা এসেছিলাম বলে দিনে আর ঘরটা চিনতে পারিনি! তা ছাড়া বাসা ভাড়ার কথা বললে আপনি যদি বাসাটা দেখতে চান! তাই...!'

'সেটা না হয় বুঝলাম! কিন্তু কাগজে বিজ্ঞাপনের কথা না বলে ওকে তুমিই তো খবরটা দিতে পারতে যে, আমরা ওকে কিছু বলবো না!'

'ও আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতো না!'

এতদিন এক সঙ্গে কাজ করেও কেন বিশ্বাসটা এত ঠুনকো?'

‘ও জানে যে, বাপ-মাকে কষ্ট দেয়য়া আমার পছন্দ নয়। তাই ও ভাবতে পরে যে, ওকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে নেবার মতলব আঁটছি। যে কারণে তার বিশ্বাস হবার সম্ভাবনা কম ছিলো!’

‘জেল খাটবার কথাটা গোপন করেছিলে কেন?’

‘নিলয় নিষেধ করেছিলো!’

‘হুঁ। কথার মার-প্যাঁচ তাহলে ভালোই শিখেছো!’

পূর্ণা চায়ের ট্রে হাতে এগিয়ে এসে বললো, ‘ভালো আছেন দাদা?’

পাড়ের দিকে জরির কাজ করা লাল রঙের সুতী শাড়িতে চমৎকার দেখাচ্ছিলো পূর্লাকে। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর। খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মত মালা। দু’হাত ভরা লাল কাচের চুড়ির সঙ্গে শাখা। কেমন যেন অন্নপূর্ণার কথাটা মনে চলে এলো।

আমি কিছু বললাম না। মনে হলো যে, যাবতীয় গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে যাবার মূলে আছে পূর্ণা। শাশুড়ির একটু আদর পেয়েই সব কথা উগড়ে দিয়েছে এক নিশ্বাসে!’

মাসীমা বললেন, ‘বউ, তোমাকে যা যা বলেছি সব এক এক করে বলবে ওকে! তারপর আমি এসে বাকিটা বলবো!’

ছেলের বউকে আদেশ করে তিনি চলে গেলেন ঘরের ভেতর।

পূর্ণাকে একা পেয়েই বললাম, ‘বেঈমান! সব কথাই বলে দিতে হয় নাকি? আপনার বাবা আপনার হাজবেন্ডকে জেল খাটিয়েছেন এটা বলতে খারাপ লাগলো না?’

পূর্ণা চা-নাস্তা এগিয়ে দিয়ে বললো, ‘খারাপ লাগবে কেন? বাবা এসব কি নিজের মন থেকে করেছেন নাকি?’

‘এটা কি বলছেন?’

‘বাবা যা করেছেন, সব ছোট মায়ের বুদ্ধিতে করেছেন। আমাকে যারা বেঁধে রেখেছিলো, তারা সবাই ছোট মায়ের আত্মীয়!

‘আমার জানা ছিলো না যে, পূর্ণার বাবা কেমন বা পূর্ণার বর্তমান মা তাকে গর্ভে ধরেন নি। তাই আমার চিন্তাগুলো কেমন জট পাকিয়ে গেল। বললাম, ‘এতো খুবই অন্যায়!’

পূর্ণা আমার সামনে বসে বললো, ‘আমার শাশুড়ির ইচ্ছে যে, ছোট মা তার ভুল বা অন্যায় স্বীকার করুক! নয় তো তাকেও জেল খাটতে হবে তার আত্মীয়দের মত। কেবল এই ব্যাপারটা কোনো ভাবে বুঝিয়ে বলাটাই আপনার

এখনকার আসল দায়িত্ব। শাশুড়ির ধারণা এ কাজটা আপনিই করতে পারবেন। কিন্তু কিভাবে করবেন তা আপনিই ঠিক করবেন!’

‘আপনাদের সঙ্গে থেকে কি আমারও অপরাধ হয়ে গেল?’

‘অপরাধ ভাবছেন কেন? বলেন যে, এ পরিবারটার আস্থা আছে আপনার ওপর। ওরা আপনাকেও ভালোবাসে! আপনজন মনে করেন!’

আমি ভাবছিলাম নতুন করে এ আবার কোন ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে যাচ্ছি?

পূর্ণা বললো, ‘আমাদের বিয়েটা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত নয়। তা ছাড়া সেন পরিবারে এমন ধরনের উৎসবহীন ঘটনা ঘটেইনি বলতে গেলে! তাই সমাজে যাতে তাঁদের মাথা উঁচু থাকে সে জন্য আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চাচ্ছেন। নিলয় বর হয়ে যাবে। আমাকে বউ হিসেবে তুলে নিয়ে আসবে। সাথে থাকবে তার স্বজন। আর এ কাজ ঠিক মত করাতে হলে ছোটো মাকে বাধ্য করতে হবে। নইলে বাবাকে সে এ কাজ কিছুতেই করতে দেবে না!’

‘বেশ জটিল অবস্থা! আমি এত দিক কী করে সামাল দেব?’

‘ও আমি জানি না! তবে যন্দুর জানি ছোট মা পুলিশি ব্যাপারটাকে খুবই ভয় পান। সেটা তার কানে কোনোভাবে তুলে দিতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্যটা সফল হয়ে উঠবে!’

‘আপনার বাবার বাড়ির ঠিকানাটা লিখে দিন! আমি দেখি কি করা যায়!’

পূর্ণা একটা কাগজে তার বাবার বাড়িতে কি ভাবে যেতে হবে মোটামুটি একটা ছকও করে দিলো। সেটা পকেটে রেখে বললাম, ‘আচ্ছা দেখা যাক কন্দুর কি করতে পারি!’

নিলয় এসে বললো, ‘গুরু! আবার মনে হয় তোমার মাথায় কোনো বোঝা চাপানো হইলো!’

‘তা তো জানিসই! এখন এসেছিস মজা করতে?’

নিলয় পশে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললো, ‘গুরু! তুমি না হইলে তো আমি বউ পাইতাম না! মা তার পোলারে পাইতো না! তুমি কিছু একটা না করলে আমরা তো শান্তিতে থাকতে পারমু না!

‘তাহলে চল! আমাকে তোর শশুর বাড়িটা দুর থেকে দেখিয়ে দিবি!’

‘ঠিক আছে, চল!’

পূর্ণা বললো, ‘আমি প্রার্থনা করি দাদা আমার সফল হউক!’

ভোরের দিকে রায়নার ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার কারণে মনটা নিয়ন্ত্রণে থাকে না। যে কারণে তিনদিন আগে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাই। কর্কশ স্বরে বলি, 'হলোটা কি? সকাল বেলা অমন ঘেউঘেউ আরম্ভ করে দিলে কেন?'

আমার মেজাজকে পাত্তা না দিয়ে রায়না বললো, 'ওঠো! তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও! সাতটার মধ্যে আমাকে বাসে তুলে দিয়ে তুমি অফিসে যাবে!'

প্রতিশ্রুতির কথা মনে হতেই আমার মেজাজ শান্ত হয়ে আসে। উঠে বাথরুমের কাজ সেরে আমার তৈরী হতে বেশি সময় লাগে না। রায়না নাস্তা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'তাড়াতাড়ি শেষ করো! দেরি হলে লঞ্চ ফেল করতে হবে!'

বললাম, 'অসুবিধা কি? নৌকা না হয় ট্রলার তো পাওয়া যাবে! মেঘনা পেরুনোটাই হলো তোমার সমস্যা!'

'না!' রায়না কিছুটা রাগত কণ্ঠে বলে, 'ট্রলারে চড়লে ইঞ্জিনের শব্দে আমার মাথা ধরে যায়!'

ছেলেটা গুটিগুটি পায়ে আমার পাশে এসে বসলো। তার মুখে একটু খাবার তুলে দিতেই সে সেটা চিবোতে চিবোতে বললো, 'বাবা বাবা! আমরা নানুবাড়ি যাচ্ছি। তুমি আমাদের সাথে যাবে না?'

বললাম, 'না বাবা। তোমরা আজ যাও। আমি আরেকদিন যাবো!'

'তুমি আমাকে সাঁতার শেখাবে?'

'হ্যাঁ, শেখাবো!'

রায়না তার গোছানো ব্যাগটা টেনে এনে আমার পাশে রাখলো।

তারপর বললো, 'ঘরে যে টাকাগুলো ছিলো, আমি নিয়ে নিলাম!'

বললাম, 'তাহলে আমার চলবে কিভাবে?'

'কোনোভাবে ম্যানেজ করে নিও!'

দরজায় তালা দিয়ে আমরা যখন বাইরে বেরিয়ে আসি, তখন সময় সকাল সোয়া সাতটা। মনে মনে হিসাব করলাম, ন'টায় একটা লঞ্চ আছে। এখন বাসে তুলে দিলে পল্টুর বাসায় পৌঁছতে লাগবে পঁয়তালি-শ মিনিট। রিকশায় গেলে দেরি হতে পারে ভেবে একটা অটোরিকশা নিয়ে বাস স্ট্যান্ডে চলে এলাম। বাসটা মোটামুটি খালিই বলতে গেলে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। সামনের দিকে একজন মহিলার পাশে বসতে বলে ব্যাগটা রায়নার

পায়ের কাছে দিয়ে বললাম, 'ছেলেটার দিকে চোখ রেখো! পানির কাছে যেন যেতে না পারে!'

রায়না বললো, 'শুক্রবার গিয়ে আমাদের নিয়ে আসবে!'

বললাম, 'যদি ফ্রি থাকি!'

রায়না তার বড়বড় চোখ তুলে বললো, 'শুক্রবারে কিসের কাজ?'

'কত কাজই তো থাকতে পারে! তা ছাড়া ফ্রি হলে আগেও চলে আসতে পারি!'

রায়না কথাটা বিশ্বাস করলো কিনা বুঝতে পারলাম না। তবে, আমার কাছে মনে হচ্ছিলো আমি শুক্রবারে যাই এটা সে মনেমনে চায় না।

বাস ছাড়বার সময় হতেই আমি নেমে পড়লাম। অফিসে যেতে আজ দেরি হয়ে যাবে। দৌঁড়ে গুলিস্তানের একটা চলতি বাসে উঠে পড়লাম। এ সময় বাসে বেজায় ভিড় হয়। বসবার জন্য ফাঁকা সিট না পেয়ে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকি।

আমার পেছনের দিকে লোকজন ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ওপরও সে চাপ এসে পড়ছিলো। কোনোরকমে নিজকে পতনের হাত থেকে সামলে রাখলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমার সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরতে আরম্ভ করেছে।

গুলিস্তান এসে বাস পাল্টে অফিসে পৌঁছতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল।

অফিসে ঢুকেই দেখলাম আমার চেয়ারে খাঁন সাহেব বসে আছেন। আমার ভেতরটা দুরুদুরু করে উঠলো। সালাম দিয়ে বললাম, 'স্যার, কোনো সমস্যা?'

'আসেন মিয়া! কোনো কথা বইলেন না! লেট কইরা যে অফিসে আসলেন এইটাই এখন বড় সমস্যা!'

তারপর তিনি সরে গিয়ে আরেকটা চেয়ারে বসে পুরোনো একটা ড্রয়িং এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই ড্রয়িংটা বের করে কপি করেন! তারপর লাল মার্ক করা অংশগুলো চেঞ্জ করে নিয়ে আসেন!'

বললাম, 'ঠিক আছে!'

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার বললেন, 'কাজটা তাড়াতাড়ি করেন! আমি এক্ষুনি বের হয়ে যাবো!'

আমার মনটা কিছু খারাপ হয়ে গেল। এমন ধরনের চাপ পড়লে বেশির ভাগ সময়ই আমার সব কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কাজে বেশি বেশি ভুল হতে থাকে। তবুও নিজকে সাবধান করে বললাম, 'বি কেয়ারফুল!'

রেফারেন্স ড্রয়িংটাতে আনেক জায়গাতেই লাল কালিতে দাগানো ছিলো। কিন্তু পরিবর্তন হলো সামান্যই।

প্রিন্ট বের করে খাঁন সাহেবের সামনে মেলে ধরতেই তিনি বলললেন, 'ভুলটুল নাই তো?'

বললাম, 'জি না!'

'তাহলে আর দেখলাম না!' বলে, তিনি সেটা ভাঁজ করে ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেলেন। চিফের রুমে উঁকি দিয়ে দেখলাম তখনো তিনি আসেননি। আমার চেয়ারে ফিরে এসে হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। নিলয় আসেনি।

নিঃসন্দেহে সাহসী ছেলে নিলয় সেন। প্রেম করতে জানে। প্রেমের জন্য ছাড়তে পারে রাজ্য-সিংহাসন। সে তুলনায় নিজকে খুবই হীন আর কাপুরুষ বলে মনে হলো।

আলাউদ্দিনকে বললাম এক কাপ চা দিতে।

সে বললো, 'চা শেষ! কফি দেই?'

বললাম, 'দাও!'

আমি যেখানে বসি, সেখান থেকে আমাদের রিসেপশান দেখা যায়। মাঝে মাঝে শান্তাকেও দেখা যায়। আজও তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। হাঠাৎ দেখলাম শান্তা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার কানে ফোনের রিসিভার।

আমি উঠে যেতেই বললো, 'ভাবি!'

আমার বুকের ভেতরটা কাঁপতে আরম্ভ করে। রায়না তো এতক্ষণে লঞ্চে উঠে বসবার কথা! রিসিভার কানে লাগাতেই শুনলাম দীপার কণ্ঠ।

শান্তাকে বললাম, 'তুমি সব সময় দীপা আর রায়নাকে এক করে ফেল!'

শান্তা বললো, 'আমি কি করবো? আমার কাছে তো দু'জনের কণ্ঠ একই রকম মনে হয়!'

'নেক্সট টাইমে নাম জিজ্ঞেস করে নেবে!'

শান্তা হাসলো।

দীপাকে বললাম, 'তুই কোথায়? মনে মনে তোকেই খুঁজছি!'

দীপা বললো, 'ফোন করলেই কথাটা বলো! নাকি এটা তোমার কৌশল?'

'আরে না। কৌশল হবে কেন? সত্যি সত্যিই তোকে খুঁজছি!'

'আমিও তো তোমাকে খুঁজছি!'

'কেন খুঁজছিলি? বল!'

'ফোনে বলা যাবে না! আজ আমাদের দেখা হতে পারে?'

ক'টায়?

'তিনটার দিকে।'

কিছুটা ভেবে নিয়ে বললাম, 'হবে! কিন্তু কোথায়?'

'বারিধারা চার্চে চলে এসো! গেটে থাকবো।'

'ঠিক আছে!'

ফোন রেখে দিয়ে ভাবনায় পড়ে যাই। কারণ, তিনটার সময় বের হওয়াটা খুবই মুশকিলের! অনেক সময় দেখা যায় আমি বেরোবার ঠিক আগের মুহূর্তেই কাজের চাপ বেড়ে যায়। হাজার চেষ্টাতেও কাজের চাপ কমাতে পারি না। দীপাকে কথা দিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তার মাঝেই নিজের চেয়ারে ফিরে আসি।

ভেবে ঠিক করলাম যে, লাঞ্চ আওয়ারেই বেরিয়ে পড়বো। শান্তাকে বলবো যে, একটা জরুরী ফোন পেয়েই বাইরে বেরিয়ে গেছি। বুদ্ধিটা ঠিক হতেই মনটা আমার ভালো হয়ে গেল। আর একটা ব্যাপার ভেবে আশ্চর্য হলাম যে, যখনই দীপাকে মনে করি তখনই সে আমাকে ফোন করে! বুঝতে পারছি, ওর আর আমার মনের মাঝে একটা অদ্ভুত যোগাযোগ আছে!

আজ রোববার। প্রার্থনার দিন। চার্চে অনেক নারী-পুরুষের ভিড়। ছোটো ছোটো বাচ্চারাও আছে। বাইরের ফুটপাতে বসেছে অস্থায়ী মেলা। এ পথে বাসে আসা যাওয়া করবার সময় প্রায়ই এমন দৃশ্য দেখি। সপ্তাহে একটা দিন। এ ধর্মালম্বীদের উপাসনাকে কেন্দ্র করে এলাকাটা রূপান্তর হয় ওদের মিলন-মেলাতে। পাস্পরিক কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করাটাও হয়ে যায়। কিন্তু কতিপয় মানুষ চাচ্ছে যাবতীয় চার্চ, মন্দির আর প্যাগোডা মসজিদ হয়ে যাক। মেয়েরা হারিয়ে যাক বোরখার অন্তরালে। ছেলেরা আত্মগোপন করুক টুপি-দাড়ি আর আলখাল-ার আড়ালে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে তারা আঙুল বাঁকা করতেও কুণ্ঠিত নয়! তাহলে কি আমরা বর্বরতাকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছি?

দীপাকে গেটের কাছাকাছি কোথাও দেখতে পেলাম না। ঘড়ির কাঁটা তখনও তিনটের ঘরে যায়নি। একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। লোকজন চারিদিকে গিজগিজ করছে। একটা বাচ্চা মেয়ের হাত থেকে গ্যাসের বেলুনটা উড়ে যেতেই সে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলো। পাশে তার মা

হয়তো তাকে শান্ত করতে পারছে না। মেয়েটা হাত-পা ছুঁড়ে রাস্তার ওপরই শুয়ে পড়ে।

হঠাৎ গেটের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম দীপা এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু দেখছে। আমাকেই খুঁজছে হয়তো। আমি হাত তুলে তার দৃষ্টি আকর্ষন করতেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার কাছে এগিয়ে এলো। বললো, 'কখন এলে?'

ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বললাম, 'প্রায় আধ ঘন্টা।'

'আমি তো গেটের পাশেই ছিলাম!'

'খুঁজেছি। দেখতে পাইনি।'

'ভেতরে ঢোকোনি কেন?'

'সে কথাটা মনে হয়নি।'

দীপা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'চলো! তোমাকে একটা জিনিস দেখাই!'

'কি দেখাবি?

'আগে চলো তো!'

দীপা আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে।

একটা স্কুল ঘরের মত লম্বা ঘরের একটা রুমে ঢুকে আমার দিকে ফিরে তাকালো সে।

তারপর বললো, 'চলে এসো!'

আমি তার পাশে যেতেই একটা বেঞ্চে আমাকে বসতে বলে, তার ব্যাগটা খুলে একটা খাম বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'দেখ, আমার একটা চাকরি হয়েছে! পোস্টিং দেবার সময় দু'টো অপশনের কথা বলেছিলো। একটা ছিলো নেত্রকোণা, আরেকটা রাঙামাটি। আমি রাঙামাটির কথা বলেছিলাম!'

বললাম, 'রাঙামাটি তো অনেক দুর! তা ছাড়া পাহাড়ী এলাকায় তোর ভালো লাগবে?'

'চ্যারিটি মিশনের সঙ্গে ঘুরতে আমার খারাপ লাগবে না! আর শুনেছি রাঙামাটি এলাকাটা দেখতে দারুণ সুন্দর!'

'সুন্দর তো বটেই!' দীপার নিয়োগ-পত্রের বিধি-নিষেধগুলো পড়তে পড়তে বললাম, 'কিন্তু ছুটি-ছাটা তো তেমন পাবি না!'

দীপা হাত উল্টিয়ে বললো, 'ছুটি আমার দরকার নেই!'

আমার বিস্মিত হবার পালা। বলি, 'তাহলে তোর মাকে দেখবে কে?'

'দিদির সঙ্গে কথা হয়েছে! বাড়ি-ঘর তালা দিয়ে মাকে ঢাকায় নিয়ে আসবে। আর অবস্থা বুঝে পারলে আমার কাছে নিয়ে যাবো!'

এমন সময় কয়েকজন মহিলা ঘরে ঢুকতেই দীপা বললো, 'চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি! তোমার সাথে অনেক কথা আছে!'

বললাম, 'কথা আছে তো বুঝলাম! কিন্তু এখন যাবিটা কোথায়?'

'ঠিক করেছি সময়টা তোমার সাথে কাটাবো। কাজে যোগ দিতে আরো পাঁচদিন সময় হাতে আছে। এর মাঝে অন্তত তিনটে দিনের কিছুটা করে সময় আমাকে দিও! দেবে তো?'

'তা না হয় দিলাম!'

চার্চের গেট দিয়ে বেরোবার সময় দীপা আমার একটা হাত ধরে বললো, 'আমি যেদিন যাবো তার আগে দু'দিন ছুটি নেবে তুমি। আমাকে রাঙামাটি রেখে আসবে! পুরো একটা দিন এক সঙ্গে ঘুরে ফিরে তারপর তোমার ছুটি!'

'তার মানে আমাকে বাদ দিয়ে দিতে চাচ্ছিস?'

দীপা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলো। বললো, 'বাদ দেয়াটা কি খুবই সহজ কাজ?'

তারপর বললো, 'রিকশায় ওঠো!'

অনিশ্চিত কণ্ঠে বলি, 'কোথায় যাবি? তা তো বললি না!'

'চাকরি পাওয়ার আনন্দটা তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাই!'

রিকশায় উঠে দীপা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আমার কোমর পেঁচিয়ে ধরে। আমার আনন্দ হবার বদলে মনের ভেতর এক ধরনের চাপা হতাশা জেগে ওঠে। বলি, 'এখন ধরে রেখে আর কি হবে? ক'দিন বাদে তো চলে যাবি জঙ্গলে! ইচ্ছে করলেও তোকে আর কাছে পাওয়া হবে না!'

'ইচ্ছে করলেই হবে! সে ইচ্ছেটা না হয় দীর্ঘ বিরতির পর পর হবে! তবুও হবে তো!' বলে, দীপা আরেক হাতে আমার বাম গালটা ছুঁয়ে দেয়।

আমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। দীপা রাঙামাটি চলে যাবে। আমি তাকে সময়মত দেখতে পাবো না! কখনো ইচ্ছে হলে, সে ইচ্ছেটাকে দীর্ঘদিন লালন করতে হবে মনের ভেতর। কোনো এক সময় সুযোগ আসবে। তারপর যেতে পারবো তার কাছে! এ কেমন জীবন? না হলাম সৎ স্বামী না হলাম শুদ্ধ প্রেমিক!

দীপা রিকশাঅলাকে বললো, 'গুলশান দুই নাম্বার চলো!'

রিকশা চলতে থাকলে আমি বললাম, 'রায়না আজ সকালে তার বাপের বাড়ি গেছে! গত রাতে তোর কথা ভাবছিলাম। তোর সাথে তো এমন কথাই ছিলো যে, রায়না যখন আমার কাছে থাকবে না তখন সে সময়টুকু তোর। আর কি আশ্চর্য, আজই তুই ফোন করলি!'

দীপা বললো, 'তুমি যখন আমার কথা ভাবো, তখন আমি বুঝতে পারি!'

'কী করে বুঝতে পারিস?'

দীপা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, 'তখন আমার বুকের ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে যায়! মনে হয় আমার কানের পর্দায় বাজে তোমার কণ্ঠস্বর!'

বললাম, 'আমারও মাঝে মাঝে এমন হয়। কিন্তু রায়নাকে এসব বলবো বলবো করে আজও বলতে পারিনি!'

দীপা আমার দিকে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে কেমন ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'খবরদার! তোমার বউকে এসব বলতে যেও না যেন! সব মেয়ে এই একটা ব্যাপারে একাট্টা! জানতে পারলে সে কখনোই তোমাকে ক্ষমা করবে না!'

আমি সত্যি করেই বললাম, 'কিন্তু আমি তো আজও তার একান্ত নিজের হতে পারলাম না!'

দীপা বললো, 'কেউ কেউ সারাজীবন চেষ্টা করেও কারো একান্ত হতে পারে না। তার স্বত্তা থাকে খন্ডিত। ঠিক তোমার মত!'

রিকশা এগিয়ে চলে। আমার মনে বাজে দীপার আসন্ন বিদায় ঘন্টা। ইচ্ছে হয় বলি যে, দীপা তুই যাস না! থেকে যা এই ঢাকা শহরেরই কোথাও! কিছুটা কষ্ট করে হলেও! কেবল আমার জন্য!'

কিন্তু আমি শত চেষ্টাতেও কিছু বলতে পারি না। কষ্টগুলো বুকের ভেতর আরো ভারি হয়ে চেপে বসে। শব্দমালা হয়ে কণ্ঠ ফুঁড়ে বের হয়ে আসে না। হৃদয়ের অন্তরালে অনুরণিত হয় মহাদেব সাহার কবিতার লাইন:-

"সেই যে ভালোবাসার জন্য প্রথম যাতনা, দুঃখ, জাগরণ
সেটুকুই শুধু জীবনের একমাত্র শুদ্ধ শিল্প,
আর সবই ভুল পথ, ভুল যাত্রা, ভুল আরোহণ...।"

সমাপ্ত